শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

প্রেমানন্দ

প্রথম ভাগ

ওঁকারেশ্বরানন্দ

প্রেমানন্দ
জীবনচরিত
শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

তপকুমার
মূল্য ৸৹ আনা

প্রেমানন্দ

প্রথম ভাগ
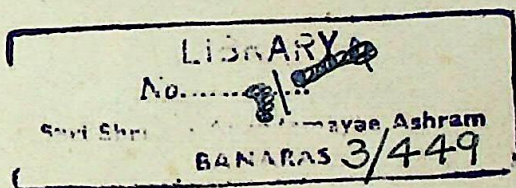
ওঁকারেশ্বরানন্দ

মূল্য ২।০ আনা
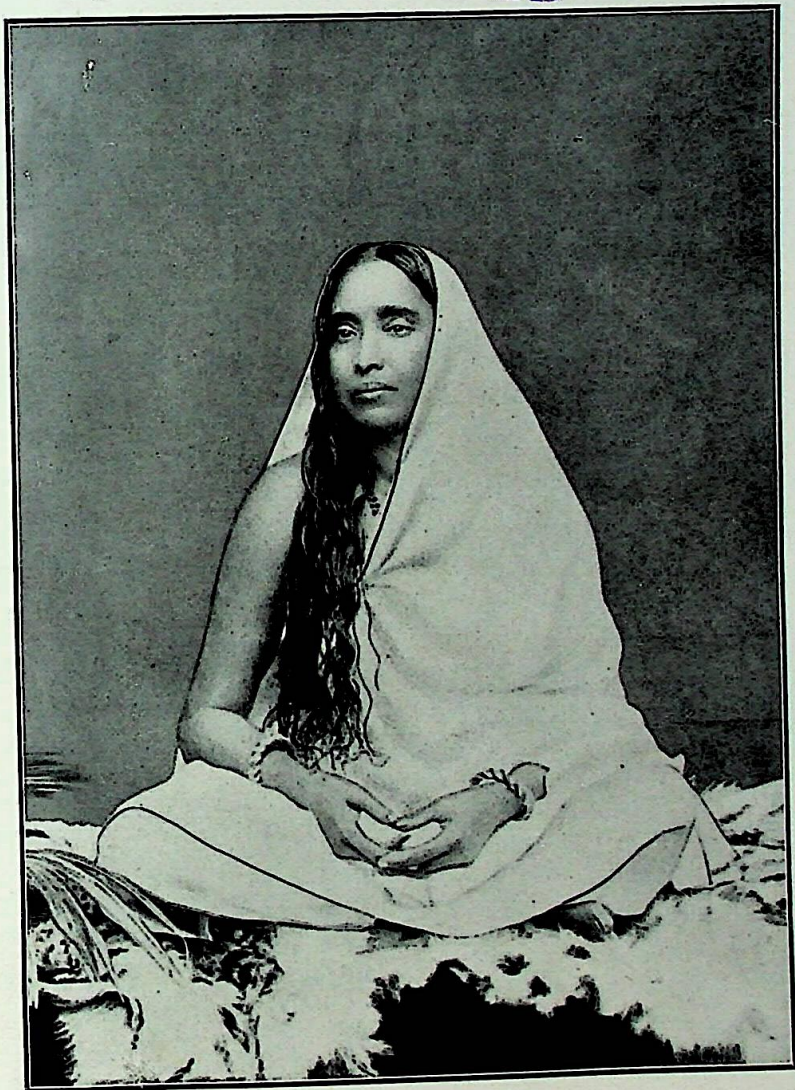
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উৎসর্গ

মা,

বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠের মা ছিলেন, আর তুমি জগতের মা। তুমিই বলিয়াছিলে, "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো ক'রে বেড়াত!" তাই তাঁর জীবন-কথা—"প্রেমানন্দ" প্রথম ভাগ, তোমার শ্রীপাদপদ্মেই অর্পণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকলের শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমানন্দ লাভ হয়।

১লা পৌষ. ১৩৪২ সাল;
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণাসপ্তমী।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী,
প্রণত সন্তান
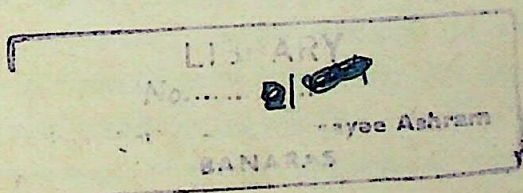
১৭৮৩ শকাব্দা । ৭ । ২৫ । ৪৩ । ৫ । ০ । ১২৬৮ সাল।

উত্তরভাদ্রপদ
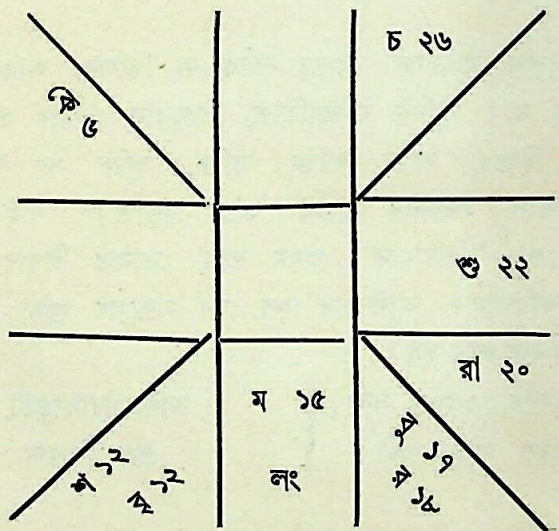
নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

প্রেমঘনমূর্ত্তি স্বামী প্রেমানন্দের সহিত একত্র বাসের শুভ-সুযোগ আমার জীবনে কয়েকবার ঘটে। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণান্তে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থানকালে তাঁহার শ্রীচরণ-ছায়ায় বসিয়া যে সকল প্রাণস্পর্শী জীবন্ত উপদেশাবলী শ্রবণ করিতাম তাহারই মাত্র কয়েকটি চিত্র উপদেশভাগে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিতাম অনতি-বিলম্বে তাহা যথাসম্ভব স্মরণ করিয়া লিখিয়া রাখিতাম। লিখিবার পূর্বে পুনরায় তৎকালে উপস্থিত কোনও ব্রহ্মচারীর সহিত মিলাইয়া লইতাম।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রাচীন সুসাহিত্যিক, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অসুস্থ শরীরেও এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরমাগ্রহে প্রায় আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পড়িয়া যদি একজনও উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করিতে সমর্থ হন, তবেই সকল উদ্যম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের সমগ্র আয় দেওঘর, কুণ্ডা, "শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনমন্দিরে" শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইতি

বিনীত
গ্রন্থকার।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও তোমার কৃপায় 'প্রেমানন্দ' ১ম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রেমানন্দ জীবন-চরিত শীঘ্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় এই সংস্করণে প্রেমানন্দের জীবন-চরিতাংশ হইতে কিছু পরিবর্জন ও তৎপরিবর্তে কয়েকটি নূতন চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। তন্মধ্যে দশম ও একাদশ সর্গদ্বয়ের উপকরণ শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের লিখিত ও উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে প্রাপ্ত। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতি

বিনীত
গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং প্রভুর লীলাসহচর সন্তানগণের শ্রীচরণাশীর্বাদে "প্রেমানন্দ", প্রথম ভাগ, প্রকাশিত হইল। ইহাতে স্বামী প্রেমানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত, দৈনিক-চিত্র, বেলুড় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাঁহার জীবন্ত প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী আছে। উপদেশগুলি মুখ্যত লেখকের ডায়ারী হইতে গ্রথিত।

সন্ ১৩৩২ ও ১৩৩৬ সালে ইহার কিয়দংশ "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ভক্ত ও সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। অনেক ভক্ত ও সাধকের আগ্রহাতিশয়ে উহা গ্রন্থকারে প্রকাশিত করিলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ যে সমুদয় উপদেশ দিতেন তাহা তাঁহার স্বীয় জীবনে আচরণে কতটা মূর্ত হইয়াছিল মাত্র তাহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতে আলোচনা করিতে লেখক প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া দিব্য ভাব-বাণী সকল শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তকে বর্ণিত চিত্রাবলী স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন আশা করি এবং যাঁহারা তাঁহার সাহচর্য্যের সুযোগ পান নাই তাঁহারাও সেই পূত প্রেমঘন সজীব-বিগ্রহের প্রেমলীলার রসাস্বাদন করিতে ও মোক্ষ মার্গের প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইবেন।

হংস যেমন নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, সহৃদয় পাঠকবর্গও তেমন প্রকাশ করিবার তাড়াতাড়িতে মুদ্রাকর প্রমাদাদি লক্ষ্য না করিয়া যেন চিত্রগুলি গ্রহণ করেন ইহাই প্রকাশকের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র, প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ভক্তগণের আগ্রহ, উৎসাহ,

সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য তাঁহাদিগকে এবং অপরাপর সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস মহাশয় নানা অসুবিধা সত্ত্বেও প্রুফ্ দেখিয়া দিয়া এবং "উদ্বোধন" ও অদ্বৈতাশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ ছবির ব্লক দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই পুস্তক সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠকগণের মন্তব্যাদি আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি যাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটি বিচ্যুতি বর্জ্জিত হইতে পারে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। অলমতিবিস্তরেণ—

বিনীত
প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় প্রেমানন্দ ১মভাগ, ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে পূজনীয় গ্রন্থকার প্রয়োজনানুরোধে সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতাংশের কিছু পরিবর্জ্জন এবং উপদেশাংশ কিছু পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শুভার্থীদের অনুরোধে পুস্তকের শোভাবৃদ্ধি করা এবং একটি বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হইল। বর্তমান বাজারে কাগজ ও ছাপান ইত্যাদির দুষ্প্রাপ্যতার এবং দুর্মূল্যতার জন্য পুস্তকখানির মূল্য ইহা অপেক্ষা কম করা সম্ভব হইল না। ইতি—

বিনীত—
প্রকাশক।

বংশ-পরিচয়

পিতামহ বংশ
(ঘোষ)
প্রাণবল্লভ
রাধাকৃষ্ণ
গৌরিচরণ
রামহরি
গোকুলচন্দ্র
তারাপ্রসাদ
মাতামহ বংশ
(মিত্র)
কন্দর্প
শোভারাম
কৃষ্ণরাম
রঘুরাম
অভয়চরণ
মাতঙ্গিনী
কৃষ্ণভাবিনী
তুলসীরাম
বাবুরাম
(প্রেমানন্দ)
শান্তিরাম

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

প্রথম ভাগ

—ঃ*ঃ—

স্বামী প্রেমানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

ও

দৈনিক চিত্র

"ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
রাধাভাবপ্রমত্তায় প্রেমোজ্জ্বলমনস্বিনে।
ভক্তানাঞ্চ বরিষ্ঠায় 'প্রেমানন্দায়' তে নমঃ॥"

কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইবার সাড়ে ছয় বৎসর পরে, কিঞ্চিদধিক সাতাশ বৎসর বয়সে, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তথায় বিল্ববৃক্ষমূলে ও পঞ্চবটীতলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করিয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রমতের সাধন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পবিত্রতার পরম আধার, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত, গুরুগত প্রাণ, সত্যের শান্তমূর্ত্তি, ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসের জমাট জীবন্ত বিগ্রহ মহারাজ প্রেমানন্দ স্বামী, হুগলী

জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রামে, সন ১২৬৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শুক্লা-নবমী তিথিতে, রাত্রিকালে, পুণ্যবতী মাতঙ্গিনীর কোল আলো করিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আঁটপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। কায়স্থ কুলের মধ্যে ঘোষ ও মিত্র বংশেরই তথায় সমধিক প্রতিপত্তি। ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বর-নিষ্ঠ, দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের এই গ্রামে ৯।১০ পুরুষের বাস ছিল। তারাপ্রসাদ ঐ গ্রামের স্বনামধন্য, দানশীল, হৃদয়বান্ কৃষ্ণরাম মিত্রের পৌত্র অভয়চরণ মিত্রের দিব্যগুণ-শালিনী, পরম ভক্তিমতী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা শ্রীমতী মাতঙ্গিনীর পবিত্র পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রথম কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী এক কন্যা, পরে তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামে পর পর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আন্দাজ সন ১২৬৯ সালে, উড়িষ্যা দেশের বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ভদ্রক্ ও কোঠারের জমীদার, স্বনামধন্য, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ কৃষ্ণরাম বসুর বংশজ বলরাম বসু মহাশয়ের হস্তে অসামান্যা রূপগুণশালিনী বাবুরাম-ভগ্নি শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সমর্পিতা হন। তখন বাবুরাম অতি শিশু। তারাপ্রসাদ স্বীয় কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার পর, কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি নাবালক তিন পুত্র ও সহধর্ম্মিণীকে গৃহদেবতা ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর চরণে সমর্পণ করিয়া অকালে আঁটপুরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী বলরাম বসু মহাশয় জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার ভ্রাতাগণের উপর জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া, ভদ্রকের কাছারী বাড়ীতে অথবা কোঠারে বসত বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল ৺ শ্যামচাঁদ বিগ্রহের সেবা, পূজা ও ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ। তিনি তথায় ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'মিরার' পত্রিকায় প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বিষয় জ্ঞাত হন। পরে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সম্ভবতঃ রামদয়াল বাবুর সমভিব্যাহারে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীচরণ দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণে সেই প্রথম দর্শনাবধি বসু মহাশয় তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন এবং বাগবাজার বসুপাড়ায় তাঁহাদের বসত বটীতে বাস ও প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়গণকেও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহার শ্বশ্রূমাতা বাবুরাম-জননীও তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে ধন্যা হন।

বলরামের মধ্যম শ্যালক বাবুরাম, গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় তাঁহার খুল্লতাত ৺গুরুচরণ ঘোষ মহাশয়ের চোর-বাগানস্থ বাসভবনে প্রথম আগমন করেন। পরে তাঁহার খুল্লতাত মহাশয় শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলায় স্থানান্তরিত হইলে বাবুরামও তৎসহ তথায়

আসিয়া, প্রথম 'এরিয়ান স্কুলে' ও পরে মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ —শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চে ভর্ত্তি হন।

ইতঃপূর্ব্বেই পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ দেবের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন এবং সে সময়ে পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এতই তীব্র হইয়াছিল যে, তিনি অবসর পাইলেই আর স্থির থাকিতে পারিতেন না ; দক্ষিণে-শ্বরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কখন কখন শুভ সংস্কার বিশিষ্ট ভক্তিমান্ কোন ছাত্রকেও তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে লইয়া যাইতেন।

শুনা যায়, বালক বাবুরাম এইরূপে তাঁহার শিক্ষাগুরু পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত তুলসীরাম বাবুর নিকট প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় অবগত হন। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঐ স্কুলের অন্যতম ছাত্র ও বাবু-রামের বন্ধু ছিলেন। শ্রীমান রাখাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন। শ্রীমৎ রাখালের সঙ্গেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার প্রথম শুভ দর্শন লাভ হয়। প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে নিজ অন্তরঙ্গ "ঈশ্বর কোটী" বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের জননীর, ঠাকুরের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এই কারণ তাঁহার ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ায় বা তথায় ২।৪ দিন বাস করায় বাড়ীতে কাহারও আপত্তি হয় নাই। এই সময় একদিন বাবুরাম মহারাজ তাঁহার

মাতাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর দুই একটী ভগবৎ প্রসঙ্গের পর, বাবুরাম-জননীকে বলিলেন, "তোমার এই ছেলেটিকে (বাবুরামের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া) দাও।" ভক্তি-মদে-মত্তা মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "বাবা! বাবুরাম আপনার সেবক হয়ে থাকবে, এত আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু এই ভিক্ষা ভগবানে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আর আমায় যেন পুত্র কন্যার শোক পেতে না হয়।"

যাহা হউক, সে সময় পবিত্রহৃদয়া মাতঙ্গিনী শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য স্বীয় পুত্র শুদ্ধাত্মা বাবুরামকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলে পর, তিনি মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে দক্ষিণে-শ্বরে শ্রীগুরু সেবায় ও সাধন ভজনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতার সময় কলিকাতা শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে অবস্থান কালে, তিনি একেবারে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুর যে কয়জনকে গৈরিক বসন দেন, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের অন্তরে বাল্যকাল হইতেই নিঃস্বার্থ অহৈতুকী ভগবৎ-প্রেম বিদ্যমান ছিল। এই ভগবৎ-প্রেম তাঁহার জন্মগত অধিকার। ঠাকুর বলিতেন, "বাবুরাম ঈশ্বর-কোটি। ওর হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ পবিত্র। ওর দেহমনে কখনও কোনরূপ অপবিত্র ভাব উদয় হইতে পারে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর লোক দেখিলেই তাহার অন্তরে কি আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার অহৈতুকী ভগবৎপ্রেম দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "ও (বাবুরাম) শ্রীমতীর অংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে—দেবী ভাব।" তাঁহার ভগ্নি কৃষ্ণভাবিনীর সম্বন্ধেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐরূপ উচ্চ ধারণা ছিল। বাবুরাম মহারাজকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখিতেন, কোথাও গমনকালে সুবিধা হইলেই তাঁহাকে সেবক রূপে সঙ্গে লইতেন। তিনি বলিতেন—"ও, আমার দরদী"

তাহার লীলাসংবরণের পর সম্ভবতঃ ঠাকুরের ঐ কথা স্মরণ করিয়াই বরাহনগর মঠে বিরজা হোম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ। প্রেম তাঁহার গুণ নহে—তিনি স্বয়ং প্রেম-ঘন-মূর্ত্তি ছিলেন।

প্রেম ও সেবার ভাব তাঁহার অতি শৈশব কাল হইতেই ছিল। আবালবৃদ্ধবণিতা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান যিনি একবারও তাঁহার পূত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রেমে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন। সুদীর্ঘকাল পরে এখনও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করেন দেখা যায়। তাঁহার প্রেমের বন্যায় পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বেষ ভুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত যোগদান ও চাঁদা দিতেন। বাবুরাম মহারাজকে তাঁহারা পীর সম্বোধন করিতেন। ঢাকার নবাব-বংশের কুলমহিলাগণ তাঁহার পবিত্রতায় আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে বাবুরাম মহা-

রাজের নিকটে, এবং তিনি ঢাকা মঠে থাকিলে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যাইতেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন, তখন সেখানে ভক্ত সমাগম যথেষ্ট হইত। ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মঠে আহারাদি শেষ করিতে কখন কখন বেলা দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত। কর্ম্মক্লান্ত ব্রহ্মচারিগণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হয়ত একদল ভক্ত অভুক্ত আসিয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতে পারিলে স্বয়ং ব্রহ্মচারিদিগের অজ্ঞাতে ভাঁড়ার খুলিয়া তাঁহাদের রান্নার ব্যবস্থা নিজেই করিতে অগ্রসর হইতেন। এমন কি রুগ্ন শরীরেও বাবুরাম মহারাজ ভক্ত-সেবায় পরাঙ্মুখ হইতেন না। অন্তিমশয্যায় শায়িত থাকিলেও তিনি নিজ শরীরের প্রতি দৃকপাত না করিয়া ভক্ত-সেবা করাইতেন। কেহ আপত্তি তুলিলে বলিতেন, "এটি আমার স্বভাব। ভক্ত-সেবাই ভগবানের সেবা।"

বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের পর, পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলিয়া গেল। বাবুরাম বেলুড় মঠের মা ছিলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের মনে ঐ জঞ্জাল অর্থাৎ অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "আলু পটল সিদ্ধ হ'লেই নরম হয়।" বাবুরাম মহারাজের চরিত্রে

এ সত্য কতটা প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবন-চরিতে দ্রষ্টব্য।

তাঁহার গুরুভাইদিগের মধ্যে পরস্পরের নিরতিশয় ভালবাসা ছিল। বরাহনগর মঠে যখন তাঁহারা সাধন ভজন করিতেন, তখন চাকর ছিল না ; জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি নিজেরাই করিতেন। প্রত্যেকেই অপরের হাত হইতে ছলে বা কৌশলে কাজ কাড়িয়া লইয়া নিজে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। কেহ ভাল খাদ্য দ্রব্য পাঠাইলে, একে অপরকে না দিয়া এমন কি বলপূর্ব্বক না খাওয়াইয়া মুখে তুলিতেন না। এ সময় নিরতিশয় দারিদ্র বশতঃ সকলেরই সম্বল কেবল মাত্র বহির্বাস ও কৌপীন। মঠে একখানি মাত্র বস্ত্র ও উত্তরীয় থাকিত ; কাহারও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি সেই বস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।

মুষ্টিমেয়, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়, ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ এত শীঘ্র যে সমগ্র জগৎময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কেবল এই ভালবাসার বন্ধন হেতু। এই ভালবাসাই যাহাতে সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিতে পারে, তজ্জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের উৎকণ্ঠা, উদ্যম ও সদুপদেশ দানাদির অন্ত ছিল না। মহারাজ গৃহী অথবা ত্যাগী ভক্তগণকে বার বার সতর্ক করিয়া দিতেন যে, এই ভালবাসার বন্ধন যে পরিমাণে শিথিল হইবে, সেই পরিমাণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারে বাধা পড়িবে। বলিতেন, "তোরা

হাজার হাজার মঠ কর্ কিছুতেই কিছু হবেনা, যদি তোদের গুরুভাইরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা না থাকে।”

স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপভাবে মঠ চালাইতে হইবে ও দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে তাহা এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস স্বামী প্রেমানন্দকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনিও তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মঠে একটি বেদ বিদ্যালয় খুলিবার প্রবল ইচ্ছা স্বামিজী তাঁহার এই গুরুভ্রাতার নিকট বহুবার, এমন কি শেষ দিন পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি নিজের সুখস্বচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত করিতেন না। গোসেবা, বাগানের কাজ, ঠাকুরের ভাঁড়ার, ঠাকুর পূজা, মঠের কোনও দ্রব্য অপচয় হইতেছে কি না লক্ষ রাখা, নূতন ব্রহ্মচারিদের সঙ্গে গোবর দিয়া নাড়ু পাকান, ব্রহ্মচারী, সাধু ও সমাগত যুবক ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান, কে কতদূর অগ্রসর হইল, কাহার কোন্ স্থানে আসক্তি বশতঃ মন আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সাহায্য করা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্যে স্বয়ং সদা ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার মঠবাসিগণের মধ্যে কেহ কোন কার্য্যে কিছুমাত্র অবহেলা করিলে মিষ্টকথা, ধমক এবং প্রয়োজন হইলে কঠোর শাসনও করিতেন। আলুর খোসা ছাড়ান হইতে, নিজের নিজের ঘর দোর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার, নিয়মিত ধ্যান জপ ও আরাত্রিকে যোগদান প্রভৃতি

ব্রহ্মচারিদিগের নিত্য করণীয় কোন কর্ম্মই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

মঠের কেহ কেহ তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া বরং তাঁহাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা করিলেও, তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। তাহার মধ্যে কিছু মাত্র সত্য দেখিলে, সেই টুকুই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

দেব-দেবীর মূর্ত্তির সম্মুখে মহারাজ আবাল্য পরম ভক্তি ভরে প্রণত হইতেন। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার সাধু দর্শন লালসা নিরতিশয় প্রবল ছিল। গঙ্গাকূলে সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তিনি ব্যগ্র আগ্রহে তাঁহাদের সঙ্গ করিতে যাইতেন; সে সময়ে তাঁহার সময়-জ্ঞান থাকিত না। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর বারাণসী ধামে গিয়া মৌনী মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে গমন করেন।

কখন কখন বেলুড় মঠে বহু সাধু সন্ন্যাসীর শুভাগমন হইত। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বাবুরাম মহারাজ অতি যত্নে সকলের থাকিবার ও ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

দেওঘরে বাবুরাম মহারাজ যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, সেই সময় স্বনামখ্যাত শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে দর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। লোক-মুখে তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারিজী স্বয়ং তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সাধু মহাত্মার সঙ্গ এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত প্রায় সকল তীর্থে গমন করিয়া তথাকার তীর্থত্ব সম্পাদন করেন। স্থানাভাবে সে সকল এখানে লিখিত হইল না।

ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বহুবার পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার কার্য্যে যান। তাহার ফলে তথাকার বহুস্থানে আশ্রম ও মঠ স্থাপিত হইয়া বহু লোককল্যাণ সাধন করিতেছে।

ইংরাজী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ পূর্ববঙ্গে প্রচারে যান। ঘারিন্দা ও নেত্রকোণা হইতে ঢাকায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া সোণার গাঁ, হাসারা প্রভৃতি অন্তরবর্ত্তী গ্রামে উৎসবাদি করিতে গিয়া দেখিলেন, গ্রামের জলাশয়গুলি কচুরি-পানায় পরিপূর্ণ থাকায় দূষিত এবং উহার জল পান করিয়া লোকে নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। তখন মহারাজ ঐ সকল জলাশয় পরিষ্কার করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিরসঞ্চিত ঔদাসীন্যে উদ্যম রহিত হইয়া পড়ায় তাঁহারা মহারাজের কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া, শরীর খারাপ সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং জলাশয়ে নামিয়া কচুরিপানা তুলিতে লাগিলেন। ঐরূপ দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া তথাকার যুবকগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া পানা তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ না করিয়া, দুই তিন মাস সহরে ও গ্রামে ঘুরিয়া তাঁহার শরীর খারাপ হয়; তৎ সত্ত্বেও পানা তুলিতে পুকুরে নামায়, বাবুরাম মহারাজ জ্বর লইয়া মঠে ফিরিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার কালাজ্বর হইয়াছে স্থির

করিলে, তদনুযায়ী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। পীড়ার একটু উপশম হইলে, বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে দেওঘরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্রথম প্রথম রোগের কিছু উপশম হইলেও, অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ইন্‌ফ্লুএন্‌জা দেখা দেয়। তথাকার চিকিৎসকগণের পরামর্শে মহারাজকে কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হইল। এখানে বহুদিন তাঁহাকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কলিকাতায় ফিরিবার চতুর্থ দিবসে কিঞ্চিৎ ন্যূন ৫৭ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তকে স্বধামে লইয়া গেলেন। নানাবিধ পুষ্প মাল্যে সুশোভিত তাঁহার পূতদেহ বেলুড় মঠে আনিয়া সৎকার করা হইল।

বাবুরাম মহারাজ মানব-লীলা সম্বরণ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র "উদ্বোধন" পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

মহাসমাধি

"বিগত ১৪ই শ্রাবণ সন ১৩২৫—মঙ্গলবার, বেলা ৪টা ১৪ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম পরিচালক, সন্ন্যাসী-কুলতিলক, মহাপ্রাণ, মহাত্যাগী আদর্শ-পুরুষপ্রবর স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মৈকাদর্শ আমাদের এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঞ্জীবনী শক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ এতাদৃশ মহাপুরুষগণের কাঁহারও তিরোধানের সংবাদ শ্রবণ করা অতি দুঃখের—আরও দুঃখের সেই সংবাদ লিপিবদ্ধ করা।

কিন্তু এই শোক-বাসরে অশ্রুধারা ভক্তির ত্রিধারায় পরিণত হইয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হউক, এখন ইহাই একমাত্র আমাদের প্রার্থনা, একমাত্র সান্ত্বনা।

যাঁহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ ভালবাসা এবং মঙ্গলাশীষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অভাব কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের এই অভাব, তাঁহদের এই চিত্তের শূন্যতা স্মৃতির তীব্রতায় পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হউক, এবং তাঁহাদের জীবন পূর্ণস্বরূপের দিকে অগ্রসর হউক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা! অভাবের ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠুন, এবং তাঁহাদের ভিতর তিনি উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজ করুন,

আমরা তাঁহাদের দেখিয়াই যেন তাঁহাকে দেখিতে পাই, এই স্মৃতিবাসরে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ক্ষুৎকামপীড়িত বাসনা-কলঙ্কিত আমাদের নিকট সত্য, সাধুত্ব ও পবিত্রতা সাধনার বস্তু। কিন্তু এই মহাপুরুষে সত্য, সাধুত্ব এবং পবিত্রতা মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত।

ঠাকুর এক সময় ইঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "এর (স্বামী প্রেমানন্দের) দেহ মনে কোনরূপ অপবিত্র ভাব পর্য্যন্ত উদয় হইতে পারে না।" যাঁহারা ইঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—সত্যই, পবিত্রতা ইঁহার একটী গুণ নহে, ইনি নিজেই পবিত্র। সে স্নেহ এবং ভালবাসা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই পবিত্র, নির্ম্মল অতুলন মাতৃস্নেহের স্বাদ অনুভব করিয়াছেন। তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জননীস্বরূপ ছিলেন। একদিনও যিনি তাঁহার কোনরূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার এই কথাই মনে জাগিয়াছে তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ত্যাগী, তিনি জ্ঞানী, সর্ব্বোপরি তিনি যেন মায়ের মত। এতাদৃশ মহাপুরুষের শিক্ষাদান কঠোরতার ভিতর দিয়া নয়—নিয়মের শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া নয়, উহা যেন মাতার বিগলিতস্নেহস্তন্যধারার আস্বাদনের ভিতর দিয়া। ভগবদ্‌স্নেহ মানুষ বুদ্ধিতে ধারণা করা দুরূহ। মনে হয়, সে স্নেহ যেন বিচারের শাসনের দ্বারা নিয়মিত। শাস্ত্রে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু খেদের বিষয়—উহা আমাদের নিকট

কতকটা কথার কথা। প্রত্যক্ষ কতকটা না দেখিলে উহা বুদ্ধিগম্যই হয় না। ভগবদপ্রাণ, ভগবল্লক্ষণ মহাপুরুষগণে ভগবানের এই স্নেহভাব দেখিলে উহার কতটা উপলব্ধি হয়। এই আস্বাদন-স্পৃহাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ভগবদ্ভাবোদ্দীপক হয়। এতাদৃশ মহাপুরুষসঙ্গ মানুষের চিত্তে ভবগৎ পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, এই জন্যই ইঁহারা আমাদের এত আত্মীয়, আমাদের এত কল্যাণকারী।

বৎসরকাল অতীত হইল, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ আগমনে দেশবাসীর মধ্যে সত্য সত্যই একটা স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে যেখানেই গিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসায়, তাঁহার সাধুত্বে তত্রস্থ অধিবাসীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনজন জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিরক্ষর মুসলমান হিন্দু সন্ন্যাসীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, ইহা একটা দেখিবার বিষয় বটে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বামী প্রেমানন্দ সত্য সত্যই প্রেমানন্দ ছিলেন। "তস্ম প্রীতি তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ"—এই কামনাহীন সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র উপাসনা এবং একমাত্র কামনা ছিল। এই মহা-পুরুষের অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলো-চনার সৌভাগ্য লাভ করিরাছেন, স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার নিকট অতি পরিচিত। এবং এই পরিচয় কতটা, সে কথা মুখে

বলিবার নয়, কেন না সে পরিচয় অন্তরের পরিচয়। আর যিনি সে পরিচয় লাভ করিতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-কথাই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত পথ। এই শোকবাসরে আমরা এই মহা-পুরুষের মহাসমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথা সর্ব্ব প্রথমে সহজ স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে সে কথা পুনরায় আবৃত্তি করি-তেছি—হে মহাপ্রাণ, তুমি দেশের, তুমি জগতের! তুমি কল্যাণ, তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ। তুমি ছিলে—আছ—থাক্‌বে।”

দৈনিক জীবন-চিত্র

ভক্তবৎসল প্রেমানন্দের পুণ্যস্মৃতি তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণের হৃদয়ে তৃপ্তি ও পুলক সঞ্চার করিতে পারে, এই ধারণায় তাঁহার একটি দৈনিক জীবন-চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ জিতনিদ্র ছিলেন। রাত্রে মাত্র তিন চারি ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী প্রেমানন্দ রাত্রি তিনটা সাড়ে তিনটায় গাত্রোত্থানান্তে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখী হইয়া শ্রীগুরু ও মা জগদম্বার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম ও আত্মনিবেদন করিবার পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন।

এখনও নিশাবসান হয় নাই। অম্বর তারকিত। মেদিনী সুপ্তিমগ্না। ছায়ালোক সম্পাতে স্বভাবের চিত্রপট সৌন্দর্যে, গাম্ভীর্যে অপূর্ব ভাবময়। মঠভূমি নিঃশব্দ, তরুলতা নিস্তব্ধ। বিহঙ্গের মুখে ভাষা নাই। প্রকৃতি ঝিল্লিরবামোদিনী, তাহার সহিত একতানে মঠপ্রান্তচারিণী জাহ্নবী হরগুণ গানে প্রেমানন্দে প্রবাহিতা। এই সময় প্রেমানন্দ মহারাজ 'জয় গুরু' 'শ্রীগুরু' রবে শ্রীমন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিবার পর প্রেমানন্দের প্রেমাহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাবুরাম তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। মুখে 'জয় গুরু' 'শ্রীগুরু'

বলিতে বলিতে বাবুরাম মহারাজ মুখ ধুইবার জল গামছা প্রভৃতি রাখিয়া একে একে মানসে মুখ-প্রক্ষালনের সামগ্রী সকল নিবেদন করিতে লাগিলেন। মুখ প্রক্ষালন শেষ হইলে বাল্যভোগ নিবেদন, হুঁকা কলিকায় তামাকু অর্পণ করিয়া পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত-সেবক ধীরে ধীরে ধ্যানঘরে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে তখন একে একে সাধু ও ব্রহ্মচারিবর্গ সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের সহিত একত্র মহারাজ ধ্যান করিতে বসিলেন। নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় সে নিস্পন্দ নয়ন, নিথর নিশ্চল দেহ, আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আর জীবনে তাহা বিস্মৃত হইবেন না। এইভাবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে, আসন ত্যাগ করিয়া পুনরায় ঠাকুর ঘরে গমন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।

অতঃপর পূজনীয় শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-বন্দন ও কুশলাদি প্রশ্ন। এই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিতে ভক্তগণ কর্তৃক ভজন-গান আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ ভজন-গান হইতে হইতে স্বর্ণমুকুটশিরে স্বর্ণকর দিনকর যেন ভজন-সঙ্গীত শুনিবার আগ্রহে কক্ষদ্বারে দেখা দিলেন।

অতঃপর বাবুরাম মহারাজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখন বেলা প্রায় ৮টা। প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাণ্ডার পরিদর্শন। ঠাকুরের ভোগরাগের ঐ দিন কিরূপ ব্যবস্থা হইবে সাময়িক কর্মাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীকে তৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অপর

কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ তরকারি কুটিতে বসিয়া সকলকে তরকারি কোটা সম্বন্ধে উপদেশ ও কার্যত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন,—কিভাবে ঝোলের, ভাজা, ডালনা প্রভৃতির কুট্‌নো কুটিতে হয়। অনভিজ্ঞ কেহ আলুর খোসা পুরু করিয়া ছাড়াইলে বলিতেন, "ওরে, সংসারী গৃহস্থগণ কত স্বার্থত্যাগ করে এসব পাঠিয়ে দেন, কত শ্রম এবং দুঃখে তাঁরা উপার্জন করেন, তাঁদের দ্রব্য সামান্য পরিমাণ অপচয় করাও আমাদের অন্যায়।" এই কুট্‌নো কোটার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকথার আলোচনা।

তরকারি কোটা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মহারাজ উঠিয়া স্নানে গেলেন। তারপর স্নানান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার জন্য ঠাকুর ঘরে গমন করিলেন। তিনি ন্যাসাদি শাস্ত্রীয় বিধি সকলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, ঐকান্তিক প্রেম ভক্তি অনুরাগ সহ ভাবের পূজা করিতেন। এইভাবে ঠাকুরের ইষ্টকবচাদি পূজা শেষ করিতে বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজিল। ঠাকুর ঘরের পূজা সমাপ্ত হইবার পর, সুরধুনী নীরে পুষ্প-চন্দন দিয়া গঙ্গামাতার শ্রীচরণ পূজা ও দক্ষিণেশ্বরাভিমুখী হইয়া ঠাকুর প্রণাম। পরে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ ও চায়ের টেবিলের সন্নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলি সম্বন্ধে আলোচনা, কোন ভক্ত উপস্থিত না থাকিলে ঠাকুরের গোশালা বাগান প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ।

তারপর বেলা সাড়ে এগার বারটায় অন্নভোগ উঠিলে বাবুরাম মহারাজ তাহা নিবেদন করিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ

বা বিবেকানন্দ স্বামিজীর ভোগ নিবেদন বা পূজাদি কার্যে অণুমাত্র ত্রুটী হইলে মহারাজ অধীর হইয়া পড়িতেন এবং প্রয়োজন হইলে ত্রুটীকারককে কঠোর শাসন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের যথারীতি ভোগ ও শয়নাদি দিয়া বেলা সাড়ে বারটায় ব্রহ্মচারী সাধুদিগের সহিত একত্রে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ, কিন্তু তৎপূর্বে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেন মঠে উপস্থিত কেহ অভুক্ত আছেন কি না।

মহারাজ স্বয়ং উদারপন্থী ছিলেন কিন্তু ঠাকুর পূজা অথবা অন্ন পরিবেশন ব্রাহ্মণেতর জাতি দ্বারা কখন করাইতেন না। অথচ এরূপ সুকৌশলে উক্ত কার্য সম্পন্ন হইত যে কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে, এরূপ সন্দেহ বা তন্নিমিত্ত কোন ক্ষুণ্ণভাবের উদয় হইতে পারিত না।

আহারাদি সমাপন হইবার পর, উপরের ঘরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম। কখনও কোনও ভক্তকে পত্র লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন হইলে এই বিশ্রামের সময়টুকু সেই কার্যে অতিবাহিত হইত। বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সাধু ব্রহ্মচারীদিগের ক্লাসে যোগদান, তারপর অপরাহ্ণ ৪টার সময় ঠাকুরের বৈকালি নিবেদন করিবার পর নীচে নামিয়া উপস্থিত ভক্তগণের সহিত ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতেন।

অতঃপর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ঠাকুরের আরাত্রিক, স্তবপাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া জপ ধ্যানে বসিতেন। জপ ধ্যান শেষ হইলে দর্শক কক্ষে কোন দিন সমবেত ভক্তগণের সহিত কীর্তন,

কোন দিন স্বামিজীর গ্রন্থ পাঠ, কোন দিন বা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা আলোচনা। তাঁহার চিত্তহর নৃত্যে কোনও দিন কীর্তন এরূপ জমিয়া যাইত যে, সে দিন পাঠ বা আলোচনা হইত না। এইরূপে ভোগের ঘণ্টা বাজিলে মহারাজ নৈশভোগ নিবেদন করিয়া দিতেন। তারপর ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আহারাদির পর বিশ্রাম।

এই তাঁহার দৈনিক জীবন-চিত্র। কিন্তু কখনও যে ইহার ব্যতিক্রম হইত না এমন নয়।

বেলুড়মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট, রবিবার, ভারতের এক মহা দুর্দিন। ঐ দিন নবযুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৺গোপালকৃষ্ণ ঘোষের কাশীপুর বাগান বাড়ীতে ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, গোলাপ মা, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতেন। তন্মধ্যে যে কয়জনকে শ্রীরাম কৃষ্ণ স্বহস্তে গৈরিক বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—শ্রীনরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), যোগিন (স্বামী যোগানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)।

এই সকল অন্তরঙ্গ ভক্তকে বস্ত্র বিতরণ করিয়াও একখানি বস্ত্র উদ্বৃত্ত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানি গিরিশচন্দ্রকে অর্পণ করিবার জন্য আদেশ দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবার পর, গৃহীভক্ত

রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মাস্থি কাঁকুড়গাছিস্থ তাঁহার উদ্যানে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। তাহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী ভক্ত পূজনীয় শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)। ত্যাগী ভক্ত-গণের অভিপ্রায়, যে-ভাগীরথীতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের অধিকাংশ দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাকে তিনি সর্বদাই ব্রহ্মবারি বলিয়া উল্লেখ করিতেন, যে জাহ্নবী মহা-দেবের ন্যায় তাঁহার প্রিয় হইতেও প্রিয়তরা ছিল, সেই পবিত্র সুরধুনী কূলে কোন স্থলে সে পূত ভস্মাস্থি সমাহিত হয়। ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দির নির্মাণের জন্য হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ঐ টাকায় ভাগীরথী তীরে উপযুক্ত জমিতে শীঘ্র সমাধি-মন্দির নির্মাণ সম্ভব নয়, অথচ কাশীপুরের বাগান বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে। এদিকে নিরাশ্রয় ত্যাগী ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র ভস্মাস্থি রক্ষা করিবেন কোথায়? তাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রবল .অন্তরায়। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার কাঁকুড়গাছির উদ্যানে সমাধিস্থান ধার্য করিবার নিমিত্ত গৃহী ত্যাগী সকল ভক্তকেই জিদ করিতে লাগিলেন। এই মতভেদ হইতে গৃহী ও ত্যাগী ভক্তগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সম্ভাবনা যখন বর্ধিত হইবার সূত্রপাত হইল, তখন নরেন্দ্র নাথের ইঙ্গিতে পূজনীয় শশী

মহারাজ শ্রদ্ধেয় রামবাবুর অজ্ঞাতসারে, কলস হইতে অধিকাংশ অস্থি লইয়া একটি বড় তাম্র কৌটায় রাখিলেন, পরে জন্মাষ্টমীর দিন অস্থি-কলস রামবাবুকে প্রত্যর্পিত হইল।

ভাদ্র মাস শেষ হইলে কাশীপুরের বাগান বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের অধিকাংশ দ্রব্যই সন্ন্যাসী ভক্তগণ বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে স্থানান্তরিত করিলেন, অবশিষ্ট দ্রব্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যত্নপূর্বক লইয়া গেলেন।

মহামহীরুহ ভূপতিত হইলে পক্ষিগণের যেরূপ দুর্দশা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাংসারত্যাগী ভক্তগণের এখন অনুরূপ অবস্থা। সকলেই নিরাশ্রয় সুতরাং দুএকজন ব্যতীত সকলকেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিতে হইল। এখানে সেবক ভক্তগণের আর এক বিপদ। ঠাকুরের পীড়ার সময় কেহ কোনও দিকে দৃকপাত করেন নাই, কেহ সংসারের কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া, কেহ স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিলে তাঁহাদের অভিভাবকগণ জিদ করিতে লাগিলেন, "আর কেন, সেবা কার্য তো শেষ হইয়াছে, পুনরায় পরিত্যক্ত স্কুল কলেজে যোগদান, অসমাপ্ত পাঠ সাঙ্গ কর এবং সংসার ধর্মে মন দাও।" পীড়াপীড়ি, পীড়ন অতিরিক্ত পরিমাণে চলিতে লাগিল। ত্যাগী ভক্তগণ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই সময় সহায় হইলেন ঠাকুরের

রসদ্দার সুরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি ত্যাগী ভক্তগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি মাসে মাসে তোমাদের খরচ চালাব। তোমরা সকলে মিলে আমাদের মত সংসার-সন্তপ্ত অভাগাদিগের জন্য একটি জুড়াইবার 'আড্ডা' স্থাপন কর। সকলে উৎসাহিত হইয়া গঙ্গাতীরে বরাহনগরে পরামাণিকঘাট রোডে সামান্য ভাড়ায় টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুন্সী মহাশয়দের অতি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে জুড়াইবার 'আড্ডা' স্থাপন করিলেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সূত্রপাত।

বরাহনগরে জুড়াইবার "আড্ডা" অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইল। ভক্তগণ বলরাম-মন্দিরে রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিয়া মঠে রক্ষা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোখানি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূজা করিতেন এবং যাহাতে ফুল চন্দন অর্পণ করিয়া ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "এর পর এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে," কাষ্ঠ সিংহাসনে তাঁহারও প্রতিষ্ঠা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হুট্‌কো গোপাল (মঠের বড়দাদার[১] ভাই) কয়েক দিন একাকী এই বাটীতে বাস করেন, পরে বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য সকলে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া, ধর্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিতেন।

ইংরাজী ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পূজাস্পদ

১ মৃত্যু ৫ই কার্তিক ১৩৪২।

নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী প্রভৃতি মহারাজগণ আঁটপুরে তুলসীরাম বাবুর ভবনে উপস্থিত হইয়া সাত আট দিন সাধন, ভজন ও স্বাধ্যায়ে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কৌপীনধারী সন্ন্যাসিগণ মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর বাটীর সংলগ্ন পূজার দালানের অগ্নি-কোণে ধুনি জ্বালাইয়া ও গায়ে ভস্ম মাখিয়া ধ্যান জপে বসিতেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "বিদ্যা পেতে সাধ যদি মন, চাঁদ মুখে ছাই মাখ না।"

ঐ স্থানে একদিন সন্ধ্যার পর সকলে ধুনির পার্শ্বে বসিয়া যিশুখৃষ্টের সুমহান ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা ও প্রেম-ধর্মের উপদেশাবলি আলোচনা করিতে করিতে গভীর তন্ময়তা লাভ করেন। সেই সময় একজনের মনে হঠাৎ উদয় হইল আজ যে ২৪শে ডিসেম্বর, পরদিন খৃষ্টমাসডে। পূর্বে তাঁহাদের ইহা স্মরণ ছিল না। সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপায় এবং প্রেরণায় যে এই আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, সকলেরই তাহা ধারণা হইল। বিস্মিত হইয়া পরস্পর মুখ চাহিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঠাকুরের এই প্রেরণা আমাদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত। তিনি যে ত্যাগমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের সকলের হস্তে গেরুয়া বস্ত্র দিয়া নিঃশব্দে আমাদের ভবিষ্যৎ পথের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপ্রদর্শিত ত্যাগমার্গে চলিতে যদি আমাদের প্রত্যেকের প্রাণান্ত হয় তাহাও স্বীকার, তথাচ আর আমরা ঘরে ফিরিব না।"

সেই প্রজ্বলিত ধুনির পার্শ্বে বসিয়া সকলে সমস্বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, আর কেহ সংসারে ফিরিবেন না। আঁটপুর গ্রামে আরও ২।১ দিন কাটাইয়া সকলেই বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংসার-ত্যাগী ভক্তগণ যে অলোকসামান্য কঠোর তপস্থায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র জীবনীতে তাহার বিশদ বর্ণনা করিবার স্থানাভাব।

ইংরাজী ১৮৮৬ সালের শেষাশেষি হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মঠ বরাহনগরে ছিল। ইংরাজী ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ভূমি বিজয় করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার পর হইতে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকট আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হয়। এইখানে মঠ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে স্বামিজীর পাশ্চাত্য স্ত্রীভক্ত মিস অলিবুল, মিস হেন্‌রিয়াটা মুলার ও অপরাপর কয়েকটি ভক্তের প্রদত্ত অর্থে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে একটি পুরাতন একতলা বাড়ী সমেত কম বেশী ১৮ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। ইহাই ভাবী বেলুড় মঠের সূচনা। বেলুড় মঠের জমির বায়না হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলমবাজার হইতে ভাবী মঠভূমির সন্নিকটে গঙ্গাতীরে ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার মঠ উঠাইয়া আনা হইল। কিছুদিন পরে বেলুড় মঠের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমায় কাঁধে করে যেখানে নিয়ে গিয়ে বসাবি আমি সেখানেই থাকব।" তাঁহার ঐ উক্তি স্মরণ করিয়া

পূজ্যপাদ স্বামিজী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ী হইতে তাঁহার পবিত্র ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্র কৌটাটি স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ সহ বর্তমান মঠে লইয়া গিয়া ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ফটো সহ ঐ ভস্মাস্থি যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল নব প্রতিষ্ঠিত মঠে অভিনব আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন মঠের জমি ও বাড়ী এত বিস্তার লাভ করে নাই, সাধু ব্রহ্মচারীর সংখ্যাও খুব কম ছিল। বেলুড়ে ষ্টীমার ঘাটও হয় নাই।[২] সাধারণত কলিকাতা হইতে ভক্তগণ সেই সময় নৌকা যোগে অথবা গাড়ীতে অথবা রেলপথে মঠে যাইতেন।

নৌকা হইতে মঠের ঘাটে নামিলে প্রথম পোস্তা, পোস্তার পর প্রাঙ্গণ, তৎপরে দ্বিতল মঠ-বাটী। এই বাড়ীতে সাধুগণ থাকেন। নীচে ৬টি ও উপরে ৫টি ঘর। পোস্তা ও প্রাঙ্গণ পার হইয়া নীচে মঠে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বড় বারান্দা। এই বারান্দায় কয়েকখানি বেঞ্চি পাতা আছে। এই বেঞ্চিতে বসিয়া পূজনীয় রাখাল মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি কতদিন কত রাত্রি ভক্ত ও সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে উপদেশ দিতেন। ঐ বারান্দার ঠিক উত্তরে বড় ঘরটী দর্শকগণের বিশ্রামাগার

২ পরে ষ্টীমার ঘাট হয়, এক্ষণে ঐ লাইন বন্ধ হইয়াছে।

(ভিজিটার্স রুম)। এই ঘরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বৈকাল ৩টায় ও রাত্রে ধ্যান জপের পর ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণকে লইয়া কখনও পাঠ বা ঠাকুরের কথা আলোচনা ও কখন ভক্তসঙ্গে কীর্তনে নাচিতেন ও গাহিতেন। পূর্বোক্ত বারান্দার ঠিক পশ্চিমে তুটি মাঝের ঘর ও উভয়ের মধ্যে ভিতরে যাইবার প্রবেশ-পথ এবং তৎপশ্চিমে আর একটী পশ্চিমমুখী বারান্দা। এই বারান্দায় কয়েকটী বেঞ্চি ও টেবিল পাতা থাকিত। এই স্থানে সকাল ও বৈকালে সাধু ও ভক্তগণ চা পানের জন্য একত্রিত হইতেন। আবার এই বেঞ্চির উপর বসিয়া পূজনীয় সারদানন্দ স্বামী, শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, শিবানন্দ স্বামী, তুরীয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ দিবানিশি কত উপাদেশামৃত অকাতরে জগৎকে বিলাইতেন। এই সকল স্থানের পুণ্য ও পবিত্র স্মৃতি সকল পুরাতন ভক্ত ও সাধুগণের মনে চির জাগরূক থাকিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তখন মঠে ডিসপেনসারি বিল্ডিং (দাতব্য ঔষধালয়) নির্মিত হয় নাই। ঐ বারান্দার ঠিক উত্তরে একটি বড় ঘরে এক পার্শ্বে তুইটী পুরাতন আলমারিতে কিছু হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি ঔষধ থাকিত। এই ঘর হইতেই পূর্বে রোগীদিগকে ঔষধ ও অবস্থাবিশেষে কখনও কখনও পথ্যও বিতরিত হইত।

পূর্বোক্ত বারান্দার দক্ষিণে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিলে প্রথম লাইব্রেরী (অধুনা নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত), তারপর জগৎবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের কক্ষ।

তথায় তাঁহার জিনিস পত্র আসবাব সযত্নে রক্ষিত ও পাদুকা নিত্য পূজিত হয়। ইহার উত্তরে দুইটি ঘর ও বারান্দা। পূর্ব দিকের বড় ঘরে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও ইহার পশ্চিমে বাবুরাম মহারাজের কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। বারান্দায় বসিয়া পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিত্য গঙ্গা দর্শন ও কত ধর্ম পিপাসু ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের জটিল প্রশ্নগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন। মাঝে মাঝে কোনও কোনও জিজ্ঞাসু সাধকের আগ্রহ অধিকতর বাড়াইবার জন্য বলিতেন, আর একদিন এস। সকল সম্প্রদায়ের সাধক ও ভক্ত ঐ উপরের বারান্দায় তাঁহার শ্রীপাদমূলে বসিয়া নিজ নিজ সন্দেহগুলি মিটাইয়া লইতেন, কেহ চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতেন। মঠে আসিয়া ইঁহাদের শ্রীচরণতলে বসিলেই সংসার তাপ জুড়াইয়া যাইত।

মঠের ফটক পার হইয়া প্রথম স্বামিজীর সমাধি-মন্দির। তথা হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মঠ বাটীতে[৩] আসিলে প্রথমেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা বৃহৎ চাতাল। এইস্থানে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ প্রায়শঃ বৈকালে উপস্থিত ভক্তগণের সহিত ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতেন। চাতাল পার হইয়া দ্বিতল মঠ-বাটীর পশ্চিমে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। উহার উত্তর পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দ্বিতল ঠাকুর-বাড়ী, উপরে পূর্বমুখী

৩ মঠ বাটী পৌঁছিবার পূর্বে শ্রীশ্রীমার ও ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সমাধি-মন্দির।

মার্বেল পাতা ঠাকুর-ঘর। তথায় ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থি ইষ্টকবচ সাবধানে ও সযত্নে রক্ষিত হইত। ইহার উত্তরে তাঁহার শয়ন ঘর। শয়ন ঘরের এক কোণে আলমারিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সখীভাবে সাধনকালে ব্যবহৃত ওড়না, কাঁচুলি ও অন্য কয়েকটি দ্রব্য সযত্নে রক্ষিত আছে। ঐ দুইটি ঘরের সম্মুখে দালান। এখানে ভক্তগণ বসিয়া স্তবপাঠ করেন। ঠাকুর-ঘরের ঠিক দক্ষিণে একটী লম্বা বারান্দা, ঠাকুর-ঘরের পশ্চিমে ধ্যান-ঘর। সকাল ও সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠের ব্রহ্মচারী ও সাধুগণকে লইয়া কখন এই বারান্দায়, কখন দালানে, কখন ধ্যান ঘরে বসিয়া ধ্যান জপ করিতেন।

ঠাকুর-বাড়ীর দক্ষিণে বৃহৎ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে গোলপাতায় আচ্ছাদিত একটী গোলাকার বেদী ছিল। তথায় ধুনি জ্বালিয়া কেহ কেহ রাত্রে জপ ধ্যান করিতেন। বর্তমানে ঐ বেদী স্থানান্তরিত হইয়াছে। পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি দিবসে প্রাতঃকালে উক্ত বেদীর উপর তাঁহার পরিব্রাজক বেশধারী তৈলচিত্র নানা পুষ্পমালায় সুশোভিত করিয়া প্রদর্শিত হইত। বেদীর নীচে উঠানের উপর সতরঞ্চ পাতিয়া ভক্তগণ স্বামিজীর পরম ভক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত নিম্নলিখিত স্তবটি এবং অন্যান্য সঙ্গীত সমস্বরে গান করিতেন—

"মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্॥"—ইত্যাদি।

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ

প্রথম সর্গ

ত্যাগেই পরম শান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

"অনুভূতিং বিনা মূঢ় বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন মোদবৎ॥"

[জগৎ ত্রিকালমে হ্যায় নেই—বলা সোজা]

আজ কৃষ্ণা নবমী, বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, ইংরাজী ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। দিবাকর অল্প-ক্ষণ হইল করজাল সঙ্কোচ করিয়া অস্ত গিয়াছেন। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হইল। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ," পূজারী স্বয়ং দেবতা, নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম; ত্যাগ প্রেম ও আনন্দের মূর্ত-বিগ্রহ—স্বামী প্রেমানন্দ। তাঁহার দেহকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল, পরিধানে গৈরিক বসন, গায়ে গৈরিক উত্তরীয়, বাম হাতে ঘণ্টা, দক্ষিণ হস্তে প্রজ্বলিত পঞ্চ-প্রদীপ, মন অন্তর্মুখী। ভক্তগণ ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে দালানে দাঁড়াইয়া করযোড়ে এই দেব-মানবের আরাত্রিক দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিতেছেন।
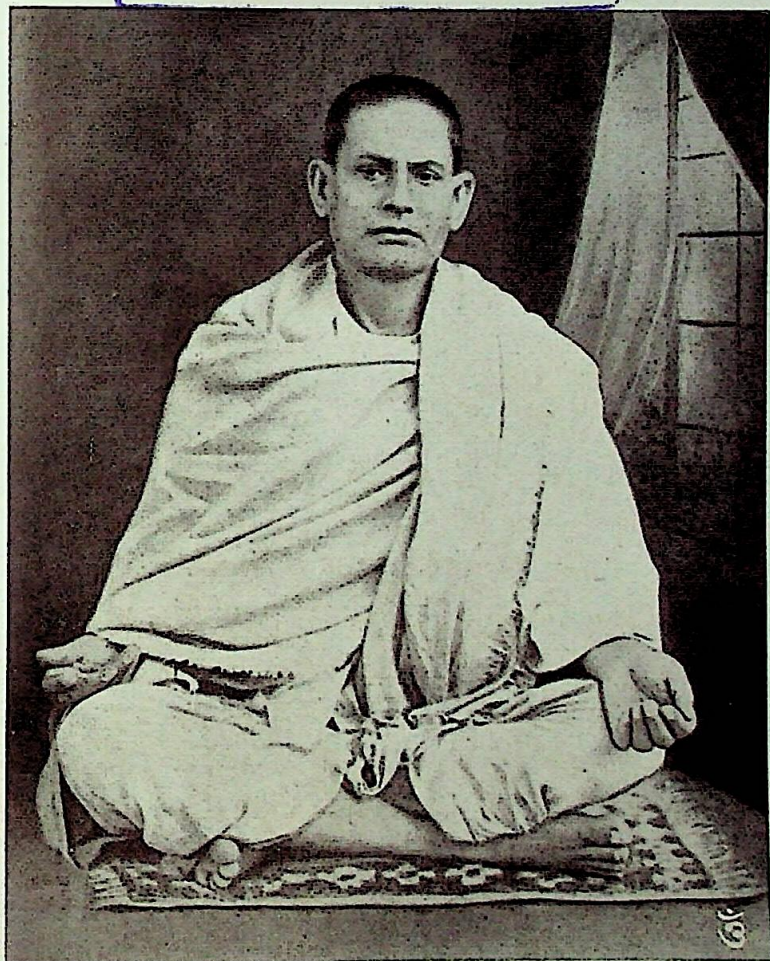
স্বামী প্রেমানন্দ

আরাত্রিক শেষ হইল, এইবার স্তবপাঠ হইবে। মঠের ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দও তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে ঠাকুর ঘরের সম্মুখে দালানে উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন, এইবার স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়," এই স্তব সমস্বরে গীত হইতে আরম্ভ হইল।

পরে "ওঁ হ্রীং ঋতং" প্রভৃতি স্তোত্রটি শেষ করিয়া "ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ," বলিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই কয় মাস খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, ঐ সময় মঠে সাধুর সংখ্যা খুব কম হইত। আবার শীত পড়িলে নানা স্থান হইতে সাধুগণ আসিয়া মিলিত হইতেন। স্বামী গিরিজানন্দ, শ্যামানন্দ, ব্রহ্মচৈতন্য, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন মঠের সাধু উত্তরকাশী, লছমন্‌ঝোলা, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কয়েক মাস সাধন ভজন করিয়া কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাৎ মঠে ফিরিয়াছেন।

রাত্রি আন্দাজ ৭॥০টা ৮টা হইবে। মঠের সাধু, ব্রহ্মচারী অনেকেই স্তব পাঠ ও জপ ধ্যানান্তে দর্শকগণের বিশ্রাম-কক্ষে (visitors' room) উপস্থিত হইলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ সকলকে লইয়া কোনও রাত্রে ভজনে উৎসাহ দেন, কখনও পুস্তক পাঠ হয়, আবার কখনও বা তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনাইয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন।

হৃষীকেশ হইতে আগত সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন ঃ—

"তোরা সব হৃষীকেশী সাধু হয়ে গেলি! তাদের বোল্ 'জগৎ ত ত্রিকাল্‌মে হ্যায় নেই'—সেখানে এক একখানা গেরুয়া পরে ভিক্ষে করে বেড়ান ও গৃহস্থদের ঠকাবার জন্য গীতা ও বেদান্তের শ্লোক মুখস্থ করা, এই করলেই সাধু হয়ে গেল? ও সব, বাবা, এখানে চলবে না। এ ঠাকুরের রাজত্ব! তাঁকে আদর্শ (ideal) করে নিয়ে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যাতে বাড়ে তাই করতে হবে। ঐ সব দিয়ে জীবনকে গড়ে তুল্‌তে হবে, তবে তো হবে। তা না—একখানা গেরুয়া কাপড় নিয়ে হৃষীকেশী সাধুর[১] মতন শুধু ফড়র্ ফড়র্ করে শ্লোক ঝাড়্‌লেই সাধু হল? পাখীর মত শ্লোক শুধু মুখে আওড়ালেই চলবে না। জীবন চাই! জীবন—জ্বলন্ত জীবন! জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না, একখানা গেরুয়া কাপড় পরা ও শ্লোক মুখস্থ করা —ছ্যা, ছ্যা।

["ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"]

"আজ কয়েকজন ভক্ত এসেছিল; তারা কথায় কথায় বললে, আমাদের গুরুদেব খুব গীতা পড়্‌তে বলেন। আমি বললুম, শুধু পড়লে কি হবে? গীতা হতে হবে, জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে

১ হৃষীকেশে প্রকৃত ত্যাগী ও অনুভূতিবান সাধুও আছেন। মহারাজ এখানে তাঁহাদের কথা বলিতেছেন না।

হবে। তা না হলে কিছু হবে না। ঠাকুর বল্‌তেন, 'গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়, গীতা মানে তাই।' অর্থাৎ গীতা, গীতা, গীতা—কিনা, ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। ত্যাগী না হলে কিছুই হবে না। ত্যাগই হচ্চে মূলমন্ত্র। আর একমাত্র ত্যাগেতেই শান্তি। এ ছাড়া আর পথ নেই।

"তোরা সব গীতা হয়ে যা। অর্থাৎ মনের ভিতর থেকে, শুধু বাহিরে নয়, ঠিক ঠিক ত্যাগী হয়ে যা। ত্যাগী না হয়ে শুধু গীতা মুখস্থ করলে আর কি হবে ? আজ কাল ঘরে ঘরে ত গীতা রয়েছে ও অনেকে পড়ছে। কিন্তু তবুও হচ্ছে না কেন ? কি করে হবে ? মন যে বিষয়ে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত। তা হলে কি হয় ? কামিনী কাঞ্চন এই দুই দিকে দুটি নঙ্গর ফেলে দাঁড় টান্‌লে শুধু পরিশ্রমই সার। যদি পারে যেতে চাস্, সকল দুঃখ দূর করতে চাস্, মনের আসক্তি, মনের গেরো কেটে দে।"

এই বলিয়া স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠে গাহিলেন—

"তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুঃখ মিটাবি, মনের গিরা দে রে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধরে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া-বেড়ী কেটে॥"

বাবুরাম মহারাজ (কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)—"ত্যাগ চাই, তপস্যা চাই, অনাসক্তি চাই, তবেই গীতার মর্ম্ম বুঝবে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। ঠাকুরকে ছাখনা কি ত্যাগী! টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না, হাত বেঁকে যেতো, তোরা তাঁকে আদর্শ করে নিয়ে জীবনকে গড়ে তোল না! জীবন গড়ে তোলাই তো ধর্ম! তা না করলে, সংসারীই হও, আর সাধুই হও, জীবন ব্যর্থ হবে, ঘুরে মরাই সার হবে, বুঝলি!"

এই বলিয়া পুনরায় ঐ ভাবে ভাবিত হইয়া গান ধরিলেন—

"মা, আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতা যুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[পাণ্ডিত্ব অপেক্ষা জীবন শ্রেষ্ঠ]

গত ২৭সে নভেম্বর, শনিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ

আহূত হন। তিনি প্রথম অস্বীকার করেন। ঠাকুরের ভক্ত ও ঐ সোসাইটির সভ্য কালিপদ বাবু মঠে আসিয়া মহারাজকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলে লইয়া যান। কালিপদ বাবু সুপ্রসিদ্ধ ৺গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও স্বনামধন্য ৺শম্ভু চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র। সেদিন বাবুরাম মহারাজ কলিকাতায় গিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন ; সেই কথা আজ বলিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ—'গ্যাখ না, সেদিন শনিবার আমি তো যেতেই চাই নি—বিশেষ জোর করাতে গেলুম। জনৈক পণ্ডিত বেশ সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, ভাষা ভাল, বেশ পণ্ডিত লোক, কিন্তু হলে হবে কি? আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখলুম, তাঁর কথাগুলো শ্রোতার ভিতর ঢুক্‌লো না— impressed হলে না। কিন্তু (বুকে হাত দিয়া) নিজে তো পণ্ডিত নই। ঠাকুর আমাকে দিয়ে কিছু বলালেন, সকলে কত আগ্রহের সহিত মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে লাগল। আমিও বললুম,—বক্তৃতায় কিছু হয় না, জীবন দিয়ে দেখাতে হবে, তবেই তার স্থায়ী ফল হয়, দেখতে পাচ্ছিস্ তো?

[পবিত্রতাই ধর্ম]

"পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম। মন মুখ এক করতে হবে। ঠাকুরকে দেখেছিলুম, পবিত্রতার জমাট মূর্তি! জনৈক ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে উপরি রোজগার করতেন,

তিনি একদিন ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় তাঁর পা ছোঁয়াতে তিনি 'আঁা—ক্' করে চীৎকার করে উঠলেন।

"ঠাকুর সমাধি অবস্থায় পড়ে না যান, এই জন্য তাঁকে ধরে থাকৃতে হত। আমাদেরও তাই ভয় হত। যদি আমাদের ছোঁয়াতে তিনি চীৎকার করে উঠেন। আমাদের গুরুভাইদের ভেতর কি অমানুষিক ভালবাসা ছিল। লোকে বলতো, এরকম ত কখনও দেখিনি, গুরুভাইয়ে গুরুভাইয়ে ত লাঠালাঠিই হয়ে থাকে। এ এক নূতন রকম দেখছি। তোদের ভেতর সেই রকম অমানুষিক ভালবাসা নিয়ে আয়। আমরা সরে গেলে তোরা সহরে সহরে হাঁসপাতালই কর্, আর বেদান্তের বক্তৃতা বা আশ্রমই কর, কিছুতেই কিছু হবে না—যদি তোদের গুরুভাইয়ের ভেতর পবিত্রতা, গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব না থাকে।

"তোরা পরস্পরে খুব ভালবাসা প্রীতি রাখবি। তোরা কি নিজেদের কম্ মনে কচ্চিস না কি? শ্রীশ্রীমার (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর) শিষ্য যারা, তারা ঠাকুরের শিষ্যের চেয়ে কিছু কম নাকি? আমি বাড়িয়ে বলছি না, হক্ কথা বলছি। ঠাকুরের বাহিরে ভাব, মহাভাব, সমাধি প্রকাশ হয়ে পড়ত; আর মা শক্তিস্বরূপিনী, সে গুলো চেপে রেখে সাধারণ লোকের মতন রান্না-বান্না করছেন।" (মতিলালকে, আধুনা স্বামী মহাদেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া) "কেমন, তুই ত তাঁকে রান্না-বান্না করতে দেখে জয়রাম বাটী থেকে আজ আসছিস?

[রাসলীলা শোনবার অধিকারী কে ?]

"৺কাশীতে রাসলীলার বক্তৃতা শুন্‌লুম—প্রথম দিন বেশ ভাল লাগল—সুবক্তা, সুগায়ক, পাণ্ডিত্যও কিছু আছে। দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিনও শুনলুম ঐ একই রাসলীলার বক্তৃতা। শ্রোতা সব কাম-কাঞ্চনে আসক্ত মলিন গৃহস্থ; তাঁকে যদি দেখতে পাই দুকথা শুনিয়ে দিই। ছাখ্‌ না, অপবিত্র গৃহস্থ ব্যক্তিরা রাসলীলার মর্ম কি বুঝবে ? যাঁরা সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁরাই ঐ সব শোনবার অধিকারী, অপবিত্র ব্যক্তি শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়। কাম-কাঞ্চনাসক্ত গৃহস্থ ব্যক্তিদেরই নিকট ঐ সব বক্তৃতা ! ছিঃ, ছিঃ !!

"তোদের কেষ্ট বুঝি শুধু বাঁশি হাতে করে গোপীদের নিয়ে সারা জীবন দিনরাত ধিতিং ধিতিং করে নেচেছিলেন ? এই বুঝি তোদের আদর্শ ?

"দেশের লোকের পেটে অন্ন নেই, পরণে কাপড় নেই, শরীরে বল নেই, ব্রহ্মচর্য নেই, রোগে জীর্ণ শীর্ণ—তার উপর বৎসর বৎসর পুত্রোৎপাদনেরও কামাই নেই—তাদের কাছে রাসলীলার কথা না শুনিয়ে, শুনাতে হবে নিষ্কাম কর্মের প্রচারক পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের মহতী বাণী—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' ক্লীবত্ব দূর কর, মানুষ হও, বসুন্ধরা ভোগ কর। আর শুনাতে হবে মহাবীর হনুমানের সেই আদর্শ জীবন।

"ভক্ত হলেই কি কেবল বাঁশী-হাতে-করা কৃষ্ণকে ভাবতে ও তাঁর নাচ দেখতে হবে ? ও, কি, ও ! ঠাকুর ওসব এক ঘেয়ে

ভাব ভালবাসতেন না। ডাকাতে ভক্তির কথা বলতেন। জানিস্ তো সেই গল্প, ঠাকুর বল্‌তেন ?

"একজন পরম বৈষ্ণব, ঝরা পাতা ও পতিত ফল খেয়ে জীবন ধারণ ও ভগবানের নাম স্মরণ মননে কালাতিপাত করেন। কিন্তু তাঁর কোমরে একখানা শাণিত তরওয়াল। একদিন নারদ ঋষি অহিংসক পরম বৈষ্ণবের কোমরে শাণিত অস্ত্র দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠাকুর, তুমি তো দেখছি পরম বৈষ্ণব, পাছে প্রাণিহিংসা হয় বলে গাছের পাতাটি পর্যন্ত ছেঁড়ো না। ঝরা পাতা বা ফল খেয়ে জীবন ধারণ কর, অথচ তোমার কোমরে হিংসার চিহ্ন তরওয়াল কেন ?' বৈষ্ণবটী উত্তর করলেন, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ ও দ্রৌপদী এই তিন জনকে কাটব বলে। নারদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,, 'এরা তিন জনই তো পরম ভক্ত, এদের কাট্‌বে কেন ?'

"তিনি উত্তর করলেন—'কী—অর্জ্জুনের এত স্পর্দ্ধা, যিনি জগতের নাথ তাঁকে কি না অর্জ্জুন সারথি করলেন! আর যাঁর দেহ নবনীত সুকোমল তাঁকে কিনা প্রহ্লাদ নিজের তুচ্ছ জীবন রক্ষার জন্য অতি কঠিন স্ফটিক স্তম্ভ হতে বার করলেন! আর দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণের আহারের সময় কিনা লজ্জা নিবারণের জন্য শরণাপন্ন হয়ে তাঁর আহারের ব্যাঘাত করলেন! তাই ঐ তিন জনকে কাটবো।"

["Crown and Glory of Life is Character"]

বাবুরাম মহারাজ—"তোরা সব সিদ্ধ হয়ে যা—অহংকার

অভিমান পুড়িয়ে ফ্যাল্। এখানে (ঠাকুরের আশ্রয়ে) এলে সব সিদ্ধ—নরম হতে হবে; কিন্তু অসত্য বা মিথ্যাকে কাটবার জন্য সঙ্গে সত্যরূপ তরওয়াল রাখতে হবে। সে সময়ে খুব রোকা হতে হবে।

"চরিত্র চাই, চরিত্র গঠিত না হলে, কি ইহকাল কি পরকাল, কোন কালে কোন বিষয়ে উন্নতি করতে পারবে না।

"দ্যাখ্ না, এনার্কিষ্ট শালারা চরিত্রহীন, তাই ধরা পড়ছে, এপ্রুভরও হচ্ছে। তারা বৃথা শক্তি নষ্ট না করে যদি ভগবানকে দিত, জগতের কত কল্যাণ হত! আর ইউরোপের ঐ মহাযুদ্ধে[১] পাশ্চাত্য জাতিরা কত রক্তপাত, কত শক্তি নষ্ট করছে। ওরা আবার বলে, 'আমরা civilized!' সব মহামায়ার খেলারে, বাবা! তোরা ওদের ঐ শক্তি ঐ উদ্যমটুকুই অনুকরণ করে ভগবানের দিকে লাগিয়ে দে।

["ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥"]—গীতা

"ঠাকুরকে কটা লোক বুঝেছে? আমরাই কি এখনো সব বুঝেছি? স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে, আলমবাজার মঠে আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ঠাকুরকে কি রকম বুঝেছ?' স্বামিজী বললেন, 'ভাই, কিছুই বুঝাতে পারিনি! কেবল তাঁর বাহ্যপ্রকাশ (outline) টুকু দেখতে পাচ্ছি।'

১ তখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল।

দ্বিতীয় সর্গ

বঙ্গে শ্রীশ্রী৺মহাবীরের পূজা প্রচলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

[পবিত্রতাই প্রার্থনীয়]

আজ শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, ইংরাজী ৩রা ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। মঠে বিশ্রাম-কক্ষে (visitors' room) সন্ধ্যার পর মহাবীর হনুমানের পূজা আরাত্রিক এবং রাম-নাম কীর্তন হইবে। অপরাহ্ণ হইতে তাহারই আয়োজন হইতেছে। দিনমণি পাটে বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হইল। আরাত্রিকের পর স্তব। সেই মধুর সুললিত সঙ্গীত ভক্তগণের মন আমোদিত করিয়া ধীরে ধীরে নীলাকাশে মিশিয়া গেল। ভক্তগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুর প্রণাম ও শ্রীচরণামৃত সেবন করিলেন।

রাত্রি আন্দাজ সাত ঘটিকা হইবে। মহাবীরের পূজা, ভোগ আরাত্রিক শেষ হইল। এইবার মধুর রাম-নাম কীর্তন হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের আশা ভরসার স্থল যুবক ও মহিলাকুলের ভিতর যাহাতে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গে ব্রহ্মচর্য-মূর্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্তিত হয়, আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ইহা ছিল আন্তরিক

ইচ্ছা। তদনুযায়ী পূজাস্পদ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী একাদশীর দিন মঠে ও বাঙ্গলার নানা স্থানে মহাবীরের পূজা ও রাম-নাম কীর্তন প্রচলন করেন। মহাতপস্বিনী অঞ্জনার নন্দন হনুমানের জীবন—আদর্শ জীবন।

এইবার রাম-নাম কীর্তন হইবে। শ্রীরামগতপ্রাণ, দাস্য-ভক্তির চরমাদর্শ, ইষ্টনিষ্ঠৈকচিত্ত, পবন-নন্দন, কৃতমস্তকাঞ্জলি মহাবীর হনুমান আকুলভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে, রুদ্ধকণ্ঠে গদগদ ভাবে রঘুপতি-চরণে প্রার্থনা করিতেছেন—

"নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥"

"হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, নির্ভরতা দাও, আর আমার মনকে কামাদিদোষ শূন্য করে দাও। তুমি আমার ও অখিল লোকের অন্তরাত্মা। আমি সত্য বলিতেছি, শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কোন স্পৃহাই নাই।"

মঠের শুদ্ধসত্ত্ব সাধু-ভক্তগণও মহাবীরের হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া পরম ভক্তিভরে ঐরূপ প্রর্থনা করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। একশত অষ্ট শ্লোকে সমগ্র রামচরিত কীর্তিত হইল। মহাবীরের ভাবে ভাবিত, ভক্তিমান বাল-ব্রহ্মচারী

সাধু ভক্ত কর্তৃক গীত রাম-নাম কীর্তন, সকলের শ্রবণ জুড়াইতে লাগিল। দর্শক ভক্তবৃন্দ কর্ণপুট দিয়া এই মধুর রামনামামৃত অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতে লাগিলেন। দাস্যভক্তির মূর্ত-বিগ্রহ পবন-নন্দন মহাবীর যেন তথায় সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন।

বাবুরাম মহারাজ পুষ্পমালায় সুশোভিত মহাবীরের চরণতলের নিকট দক্ষিণাস্যে বসিয়া গান শুনিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার ভাব হইতেছে। অবশেষে "রাম রাম জয় রাজা রাম, রাম রাম জয় সীতারাম ; সীতারাম জয় রাজারাম, রাজারাম জয় সীতারাম ; সীতারাম সীতারাম সীতারাম, রাজারাম রাজারাম রাজারাম ; জয় জয় সীতা জয় জয় রাম, জয় জয় রাম জয় জয় সীতা ; রাম রাম রাম সীতারাম ইত্যাদি নাম শুনিতে শুনিতে বাবুরাম মহারাজের পূত দেবশরীরে অশ্রু, পুলক ও গভীর ভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্তন থামিলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলে পরম ভক্তিভরে মহাবীর ও বাবুরাম মহারাজের পদতলে প্রণত হইলেন। বাবুরাম মহারাজও ভূমিষ্ঠ হইয়া আদর্শ চরিত্র মহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের কথামৃত পানের আকাঙ্ক্ষায় সাধু ভক্তগণ তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। তারপর ভক্তবৎসল, শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মহারাজ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীশ্রীঠাকুরের মতন পবিত্র লোক জগতে এ পর্যন্ত জন্মান নি। অপবিত্র লোককে তিনি ছুঁতে পারতেন না,

কেউ ছুঁলে আঁ—ক ক'রে চেঁচিয়ে উঠতেন। পবিত্রতাই ধর্ম্ম—পবিত্রতাই শক্তি। তিনি পবিত্র-ঘন-মূর্তি ছিলেন।

[পবিত্রতার মন্ত্র]

"তোরা সব তাঁর আদর্শ সাম্নে রেখে মনকে পবিত্র করে ফেল। মনেতে যখনই কাম-কাঞ্চন, দ্বেষ-হিংসা, স্বার্থপরতা, ঢোকবার চেষ্টা করবে তখনই ঠাকুর-স্বামিজীকে স্মরণ করে খুব রোক করে ঐ সব অপবিত্রতাগুলাকে দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিবি। আর মাঝে মাঝে পবিত্রতার এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করবি —"হে প্রভু, আমার ত্বক, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু ও অস্থি সকল শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। আমার মাথা, হাত, পা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, জঙ্ঘা, শিশ্ন পায়ু, উপস্থ শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। আমার বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, বুদ্ধি, সংকল্প প্রভৃতি শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। আমার প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান বায়ু শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। হে হরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষ পুরুষ, উঠ, জাগ, দাও, দাও, আমাকে পবিত্র করে দাও, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্ম-স্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। আমার

এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সকল শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, আত্মস্বরূপ আমি যেন রজঃশূন্য ও নিষ্পাপ হতে পারি।"

সকলেই নির্বাক্, নিস্তব্ধ, ধ্যানস্থ। সকলেরই মন যে কোন্ এক অজ্ঞাত পবিত্রতাময় স্বর্গীয় ভাবরাজ্যে উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এ তো শুধু মুখের উপদেশ নয় আধ্যাত্মিক-ভাব-সঞ্চার। যাঁহারা শুনিতেন, তাঁহাদেরই মন তিন চার ধাপ উর্দ্ধে উঠিয়া যাইত।

[মনের দ্বারী—জ্ঞান প্রহরী]

কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া পুনরায় মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "তোরা সব পবিত্র হয়ে যা। দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার এই গুলি মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে দে। মনের দরজার কাছে জ্ঞান-প্রহরীকে সর্ব্বদা বসিয়ে রাখবি —খবর্দার, অপবিত্রভাব যেন মনে না ঢুকতে পারে। এরাই ভগবৎপথের কণ্টক।

"তপস্যা ও বৈরাগ্যানলে মনকে পুড়িয়ে ফ্যাল্, নাশ করে ফ্যাল্। এই ভাবে জীবনটা গড়ে তোল্ দেখি। তবেই ত, ভগবানের কৃপা, তাঁর সত্তা উপলব্ধি করতে পারবি। তখন দেখ্‌বি তোদের ভেতর ও প্রত্যেক জীবের ভেতর সেই এক অনন্ত-শক্তিমান আনন্দময় ভগবান রয়েছেন। নিজে বেশ দেখতে

পাচ্ছি, কিন্তু হায়, জীব এমনি অন্ধ, এমনি আহাম্মক, যে তার দিকে নজর নেই, তুচ্ছ কাম-কাঞ্চনের দিকে শ্যেনদৃষ্টি।

[সাধু জগদ্‌গুরু]

"যদি সাধু হতে এসেছিস্, তবে দে, শালারা, স্বার্থকে অহংকে বলি দে। তবেই ত ঠিক ঠিক সাধু হতে পারবি। সাধু —জগদ্‌গুরু। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত সাধু তাঁরা ভগবানের সচল বিগ্রহ—ভাগবতে আছে। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। নাহং, নাহং, নাহং,—তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু"।

এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে ভাবে বিভোর হইয়া করতালি দিতে দিতে 'জয় প্রভু, জয় প্রভু, নাহং, নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু এই সব মন্ত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বার বার অনুচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"চিত্তশুদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে শুধু বক্তৃতায় কি ধর্ম হয়? তাতে অহঙ্কার বাড়ে ভগবানের পথ থেকে পেছিয়ে প'ড়তে হয়। শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? 'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া।' ধর্ম সম্বন্ধে বর্ক্তৃতা তো অনেকে দিচ্ছে আর পুঁথিতেও লিখ্‌ছে, কিন্তু কটা লোক তা নিচ্ছে? প্রাণের ভিতরে না বিঁধে গেলে কেউ নেয় কি?

[মুখ বন্ধ হোক, কাজ কথা বলুক]

"জীবন দিয়ে দেখিয়ে দে, তবে লোকে তোদের কথা শুন্‌বে। আমি জীবন চাই—জলন্ত জীবন। তোদের মুখ বন্ধ

হোক্, কাজ কথা বলুক। কথা না বলে, কাজে দেখা তোরা কার সন্তান! মা ব্রহ্মময়ীর বেটা—ঠাকুর স্বামিজীর সন্তান তোরা, পার্থিব নাম যশ তোদের হ্যাক্ থু হয়ে যাক্—লোকে ভাল বলবে কি মন্দ বলবে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হৃদয়-মনকে পবিত্র করে তাতে মাকে ও ঠাকুরকে বসিয়ে তাঁদের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে নীরবে মন-মুখ এক করে কাজ করে যা। এটা (মঠ) হৈ হৈ করবার যায়গা নয়, প্রকৃত মানুষ তৈ'রী করবার জন্যই স্বামিজী গড়ে গেছেন। ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় মানুষ তৈ'রী হয় না। এখান থেকে শিক্ষা শেষ করে যারা পাশ হবে তারাই জগতে চরিত্রবান, আদর্শ পুরুষ।

[চাই—চরিত্র ও ভালবাসা]

"টাকায় কিছু হয় না, চরিত্র ও ভালবাসায় সব হয়। ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন, আমাদের জন্য কি রেখে গেছলেন? কিছু না—একরকম গাছতলায় ক'টা ছোঁড়াকে বসিয়ে রেখে গেছলেন। স্বামিজী কি সে সময়ে অবতার বলে প্রচার করতে পারতেন না? তিনি বললেন, "বর্ক্তৃতা না দিয়ে, জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে তিনি অবতার কি না।" তাঁর ভাবে জীবন গঠন না করে শুধু অবতার অবতার করে চেঁচালে কি হ'বে?

"প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ হয়ে আসেন। যে যুগে যেটি দরকার সেই রকমেই তাঁকে প্রচার করতে হয়। খাঁটী

সোনায় গড়ন হয় না, তাই ঠাকুর নিজে প্রচার করতে পারেন নি। খুব উচ্চ আধার বলে, স্বামিজীকে শিক্ষা দিয়ে ঐ প্রচারের ভার তাঁকে দিয়ে গেছলেন। কই রামলাল দাদাকে তো আমাদের দেখবার ভার দিয়ে যান নি ?

[জড় ভরত ও নরেন]

"নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দ) এতো ভালবাসতেন বলে, অনেকে বলত, আপনিও জড় ভরতের মতন 'নরেন' ভেবে ভেবে ঐই হয়ে যাবেন শেষে। ঠাকুর বললেন, 'কী! আমি কি জড় নরেনকে ভাবি, ও অমুকের ছেলে, অমুক যায়গায় বাড়ী, বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, গাইতে বাজাতে পারে ?—সাক্ষাৎ শিব, জীবশিক্ষার জন্য স্থূলদেহ ধরে এসেছেন, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। ওদের খাওয়ালে লাখ লাখ সাধু ভোজনের ফল হয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[রাজর্ষি ভরতের উপাখ্যান]

(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া) বাবুরাম মহারাজ—(ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি) "ভরতের গল্প জানিস তো ? ভাগবতে আছে ?"

আমরা গল্পটি সদাশয় পাঠকবর্গকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গল্পটি এই—"পুরাকালে এই ভারতবর্ষ অজনাভবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মনুপুত্র ভগবদ্ভক্ত

মহাজ্ঞানী প্রিয়ব্রতের পবিত্র বংশে সাক্ষাৎ ভগবান ঋষভদেব অবতীর্ণ হন। তিনি ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে আত্মসমান একশত পুত্র উৎপাদন করেন। মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী ভরত ভগবান ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভগবান ঋষভ ভরতের উপর রাজ্যশাসন ভার এবং অন্যান্য পুত্রগণকে তাঁহার অনুবর্তী থাকিতে উপদেশ দিয়া সংসার ত্যাগ করেন। পরম ভাগবত মহাজ্ঞানী রাজা ভরত পুত্রনির্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার অসামান্য গুণের পরিচয়ে অজনাভ ভারতবর্ষ নামে প্রচলিত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীর পাণি গ্রহণ করেন।

"রাজর্ষি ভরত সমস্ত কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিতেন। অবশেষে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাজত্ব বিভাগ করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বনে গণ্ডকী নদীতীরস্থ পুলহাশ্রমের উপবনে একাকী গমন করিলেন। তথায় শম দমাদির অভ্যাস ও নিয়ত শ্রীভগবানের পূজা অর্চনা ও আরাধনায় পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মহারাজ ভরতের হৃদয় ক্রমশ প্রেম ও ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল ; শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমা স্মরণ-মনন ব্যতীত যাবতীয় উদ্যম তাঁহার হৃদয় হইতে শিথিল হইয়া পড়িল ; প্রাণারাম ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তনে তাঁহার হৃদয়ে ভাবের বন্যা খেলিত। একদিন রাজর্ষি ভরত গণ্ডকী নদীতীরে সন্ধ্যার সময় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গর্ভবতী হরিণী নদীগর্ভে নামিয়া

জল পান করিতেছে, ইত্যবসরে অনতিদূরে একটি সিংহের ভীষণ গর্জন শ্রবণগোচর হইল। ঐ গর্ভবতী মৃগী একান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া সহসা লম্ফপ্রদানে নদী পার হইতে চেষ্টা করিলে তাহার গুরুভার গর্ভ স্থানচ্যুত ও একটি শাবক নদীগর্ভে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ হরিণীও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

"এদিকে জননী-পরিত্যক্ত, স্রোতে ভাসমান মৃগশাবকটিকে দেখিয়া রাজর্ষি ভরত দয়াপরবশ হইয়া জল হইতে ঐ শাবকটিকে তুলিয়া নিজ আশ্রমে এত যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন যে ক্রমশ মহারাজ ভরত নিজ সাধন ভজনে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তপস্যা ও যোগানুষ্ঠানে নিতান্ত ব্যাঘাত জন্মিলেও হরিণশিশুর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ক্রমশ কাল আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভরত মৃগ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ভাবে তাঁহার দেহ ত্যাগ হইলে পরজন্মে তিনি মৃগশরীর লাভ করিয়াছিলেন।"

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ ভাবভাবিতঃ।"—গীতা

[চৈতন্য-চরিতামৃত একঘেয়ে]

"ঠাকুর আমাদের চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় এই সব ভক্তি গ্রন্থ পড়তে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে বলতেন, ও সব একঘেয়ে।

[রাসলীলা শোনবার অধিকার বিচার]

ঠাকুরকে যদি না দেখতুম, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কি বুঝতে পারতুম ? ঐ সব লোচ্চামিগুলোকে মনে করতুম 'তেজীয়সাং ন দোষায়'। ভাগ্যিস তাঁর কৃপা পাই, তবে তো ঐ সব ঠিক-ঠিক বুঝি। অপবিত্র গৃহস্থ লোকেরা রাসলীলার কি বোঝে ? তাদের কাছে ও সব বক্তৃতা দিতে নেই। যাঁরা সম্পূর্ণ পবিত্র তাঁরাই ঐ সব শোনবার অধিকারী, অপবিত্র লোকে শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়। তোদের শ্রীকৃষ্ণ বুঝি শুধু বাঁশি হাতে করে সারাদিন, সারাজীবন ধিতিং ধিতিং করে নেচেছিলেন ? ভক্ত হলেই কি খালি বাঁশি-হাতে-করা শ্রীকৃষ্ণকে ভাবতে ও তাঁর নাচ দেখতে হবে ? ও, কি ও! ঠাকুর ও সব একঘেয়ে ভাব ভালবাসতেন না। ডাকাতে ভক্তির উপমা দিতেন।

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥" গীতা

[আফিমের দরুণ পথ ভোলা]

"ঠাকুরের পবিত্রতার কথা জানিস তো ? লুকিয়ে তাঁর বিছানায় টাকা গুঁজে রাখাতে দেখেছি কাছাকাছি গিয়ে আর বিছানায় বসতে পারছেন না। আর সেই আফিমের দরুণ পথ ভুলে যাওয়া ! এ সব কি আর সাধারণ মানুষের ধারণা হয় ?

আমরা তাঁর আদর্শ জীবন দেখেছি বলেই তো তোদের জোর করে বলতে পারছি।"

[উহার দৃষ্টান্ত]

ঘটনাটি এই—"রাণী রাসমণির কালী বাটীর নিকটেই শম্ভু চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎচর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভু বাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্তায় ঐ কথা দুজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

"শম্ভু বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শম্ভু বাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া

যাইতে লাগিল। ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি ? এতো পথ নয় ? অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক্‌ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া পুনরায় শম্ভু বাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভু বাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মত হইল,—পথ আর দেখিতে পান না! বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েক বার হইবার পর, ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল, 'আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও' তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেই জন্য মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! কর্মচারীর শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে—তাহার নিকট হইতে লওয়া উচিত। নহিলে যে ভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে ;— সেইজন্যই মা আমায় এমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না। এই কথা মনে করিয়া শম্ভু বাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই। সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি

ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল'—বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই ;—রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে ; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কি না ?—তাই মা হাত ধরে আছেন। এতটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না"[১]।

[অবতার বরিষ্ঠ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ]

বাবুরাম মহারাজ—যত অবতার এ পর্যন্ত এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঠাকুরই শ্রেষ্ঠ, আমার মনে হয়—এতে আমাকে গোঁড়াই বল, আর যাই বল। তাঁদের তো আর চোখে দেখি নি, বইএ পড়া মাত্র, যাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি, এক সঙ্গে থেকেছি, তাঁর ভাব যত হৃদয়ে বিদ্ধ (impressed) হয়, বইএ পড়ে কি আর তত হয়! আমি কাউকেও নিন্দা করছি না। তাঁরা সকলেই আমার মাথার মণি।

"মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক ঘেয়ে সেই ভক্তি, আচার্য শঙ্করের জ্ঞান, বুদ্ধের হৃদয়। এবার ঠাকুরের তা নয়, বাবা! একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম—'যত মত তত পথ।' তবে জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী খুব কম বলে, ভক্তির কথাই বেশী 'কথামৃতে'।

১ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ।

[এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও]

"সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের লোককেই বলতেন, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, চন্দন কাঠের পর তামার খনি, তারপর রূপার খনি, তারপর সোনা, হীরে" ইত্যাদি।

"এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ এনে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। এক দিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আনছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বললে, বাপু, এগিয়ে যাও। পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখতে পেলে; সেদিন যতদূর পারলে, কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন; ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দন কাঠের বন দেখতে পেলে। সে সেই চন্দন কাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে করলে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখতে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে রূপা, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়ল। ধর্ম পথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই

লাভ করে আহ্লাদে মনে করো না যে আমার সব হয়ে গেছে।

[ধর্মরাজ্যের 'ইতি' নাই]

"খালি এগিয়ে যাও—ধর্মরাজ্যের 'ইতি' নেই। সাকার নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ—যার যা পথ, যার যা রুচি। একনিষ্ঠার সহিত সেইটে ধরে এগিয়ে যাও—কেবল এগিয়ে যাও। পথ নিয়ে গোল করো না—লক্ষ্যের দিকে এগোও; সেখানে জো সো করে পোঁছুলে আর গোল থাকবে না।

[গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে]

"ঠাকুরের সব ভাব নিতে পারলে না বলে·········দল বেঁধে গেল। ঠাকুর বলতেন, 'গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে'। তোরা, খবর্দার, খবর্দার, 'দল' বাঁধিস নি, তা হলে ঠাকুরের ভাব আর থাকবে না,—খবর্দার! দল কি বুঝলি? যেমন একদল বলছে, 'পুতুল পূজো করো না, গঙ্গাজলে এতো ভক্তির প্রয়োজন কি? ও তো **hydrogen** (উদজান) আর **oxygen** (অম্লজান) ও কুসংস্কার সব ছুড়ে ফেল।' আর একদল বলছে, 'নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করাই ঠিক, নির্গুণ ব্রহ্ম বলে কিছু নেই,' কেউ বলছে 'যিশু খৃষ্টকে ভজনা করা ছাড়া আর উপায় নেই;' ইত্যাদি, ইত্যাদি। একেই বলে 'দল।' তবে যে যেমন আধার নিয়ে এসেছে মহাসাগরবৎ ঠাকুরের কাছে সে সেইটুকুই পাবে।

ক্ষুদ্র আধার নিয়ে এসে সকল পথ দিয়ে গেলে ভাব হারাতে পারে ; একটা মত নিয়ে মন মুখ এক করে, তাতে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত খালি এগিয়ে যাও আর অন্য মতের প্রতি কটাক্ষপাত করো না।

[ঠাকুরের সর্বত্র চৈতন্য দর্শন]

"ঠাকুর মশারি গুঁজে দিতে বা জামার বোতাম লাগাতে পারতেন না, দরজায় খিল দিতেন না। আমাদের বোতাম এঁটে দিতে বলতেন। এক সময় নূতন কাপড় তাঁর সামনে ছেঁড়ায় তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন, যেন তাঁর লেগেছে।"

তৃতীয় সর্গ

কর্মযোগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

" তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ গীতা ৩।১৯

[আত্ম বিচার চাই]

আজ বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ, রাত্রি ৮॥০ বাজিয়াছে। মঠের সেই পূর্ব পরিচিত বিশ্রাম-কক্ষে বাবুরাম মহারাজ পশ্চিমাস্যে বসিয়া আছেন। গান হইবে। জনৈক ভক্ত বাঁয়া তবলার সুর বাঁধিতেছেন। সুর বাঁধা হইলে বাবুরাম মহারাজ :—"একটু রামপ্রসাদী গান হউক।" সাধুগণ একতানে রামপ্রসাদী গান আরম্ভ করিলেন।

"ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাহিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলুদ গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥

রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥"

আবার গান আরম্ভ হইল।

"কালী সব ঘুচালি লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন মানবি কি না মানবি সেটা ॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা তুচ্ছ কর মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা ॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
(তার) কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলি আমায় লোহাপেটা।
তবু কালী বলে ডাকি মা সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে প্রসাদ ব্রহ্মময়ীর বেটা।
মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার, মর্ম ইহার বুঝবে কেটা ॥

গান থামিলে বাবুরাম মহারাজ মধুরস্বরে "হরিবোল, হরিবোল," বার বার বলিতেছেন। বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, মন্দিরে সরাইয়া রাখা হইল। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন বাবুরাম মহারাজ কি বলেন।

আজ কাল নূতন ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে কেহ গরুর জন্য খড় কাটে, কেহ গোশালা পরিষ্কার, কেহ বা গোবর দিয়া নাড়ু পাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত

ব্রহ্মচারিগণও ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত। বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

[ভগবানে ফল সমর্পণ]

"কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করে ভৃত্যবৎ যে কোনও কাজ করা যায়, তাই বড়, তাই থেকেই চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্কাম কর্মের ছোট বড় নেই। চিত্তশুদ্ধির জন্যই তো কাজ। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' ফলের দিকে দৃক্পাত না করে, নিঃস্বার্থভাবে কেবল কাজ করে যাও।

[মনকে জেরা করা চাই]

"মনকে খোঁচাতে হবে, মাঝে মাঝে বিচার করতে হবে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে কাজ হচ্ছে কিনা, বাহিরে নিঃস্বার্থ-পরতার ভান করে ভিতরে স্বার্থপরতা, অহংভাব লুকান আছে কি না। খুব হুশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে, স্বার্থ-পরতা যেন তোদের ভিতর না ঢোকে! সাবধান!! ঢেঁকিতে যখন চাল কাঁড়ে, মাঝে মাঝে ছাখে ঠিক কাঁড়া হল কি না; তেমনি মাঝে মাঝে দেখতে হবে, মনে মনে বিচার করতে হবে কর্মের দ্বারা স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা, আসক্তি, অপবিত্র ভাব মন থেকে ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে কি না।

[নিষ্কাম কর্মই শ্রেষ্ঠ, উদ্দেশ্য হারিয়ে বড় বড় কাজ করা আদর্শ নয়]

"খুব বড় বড় কাজ করে যদি অহংভাব না কমে, তার চেয়ে অহংশূন্য হয়ে ছোট ছোট কাজ করা শ্রেষ্ঠ। কর্মই বন্ধন, আবার কর্মই মুক্তি, তবে কৌশল করে করা চাই।

এই কৌশলের নাম যোগ। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখলে নাম, যশ, লোকনিন্দার দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, কাজটাও বেশ সুসম্পন্ন হয়। আর ঐ উদ্দেশ্য হারিয়ে বাইরে বড় বড় কাজ করা আমাদের আদর্শ নয়। মানুষের কাছে ফাঁকি চলে, কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। আর কাকে ফাঁকি দেবে ? ফাঁকি দাও, নিজেও ফাঁকে পড়বে, জীবন ব্যর্থ হবে।" এই বলিয়া গাহিলেন—

"মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে তো যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচে দেনা।
(ওরে) একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥"

"তাই তোদের বলি, যদি জীবন সার্থক করতে চাস, মন মুখ এক কর, নিঃস্বার্থপর হ, ত্যাগী হ, এই আমি বুঝি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

[নিষ্কাম কর্ম্মই পূজা]

"যে নাড়ু পাকাচ্ছে, গরুর সেবা কচ্ছে, পূজারির কাজের চেয়ে তার কাজ কোন অংশে হীন নয়, যদি ঠাকুরের ভেবে

করে। এই স্বার্থশূন্যভাব আনবার জন্যই তো তোদের আমি খাটিয়ে নিই। কর্ম না করলে কর্মত্যাগ অবস্থা আসে কি? তাতে কুড়ে হয়ে যেতে হয়। গীতাতেও ঐকথা বলছে, 'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।' সংসারে গৃহস্থরাও সারাদিন নাকে দড়ি দিয়ে খাটে বটে, কিন্তু সে নিজের ছেলে মেয়ে পরিবারের স্বার্থে। তাই তাদের কাজে আরও বন্ধন বাড়ে। তারা যদি ঐ সংসারের সেবাই ভগবৎ বুদ্ধিতে করে, তাই থেকেই ধীরে ধীরে তাদের বন্ধন খসে যায়। কিন্তু মহামায়ার এমনি খেলা তা কি সহজে পারে? ঐ 'আমার', 'আমার' করেই তো মরে !!

[নিরভিমানিতা]

"বিরূপাক্ষ (স্বামী বিদেহানন্দ) যে এখন ঠাকুরের পূজা করছে, এদিকে (লেখা পড়ায়) তো খুব পণ্ডিত, কিন্তু আগে মঠে গরুর সেবা করত। সে যখন সেবারে ৺কাশীধাম গেছল, পণ্ডিত হয়েও গরুর জন্য খড় কাঠে, এই নিরভিমানিতার কথা শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী শুনে, তার উপর খুব ভাল মত (opinion) দিয়েছিলেন। আমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে গোবর দিয়ে নাড়ু পাকাচ্চি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধূলা দিয়ে কি নিজের পরকালটা খাব? তাই গোবরও কুড়ুই, নাড়ুও দিই, গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুর পূজাও করি।

[দরকচা মেরে থাকবি কেন]

"অভিমান থাকলে কিছু হবে না, অভিমান ত্যাগ

করতে হবে। আমি দেখছি তোদের ভেতর কারও কারও অভিমান আছে। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসেছিস দরকচা মেরে থাকবি কেন? এখানে এলে সবাইকে সিদ্ধ অর্থাৎ নরম, অহঙ্কারশূন্য হতে হবে। তোরা ঘরের ছেলে অভুক্ত থাকবি কেন? ভাব, ভক্তি, প্রেমে সব নরম হয়ে যা। অহংকে নাশ করে ফ্যাল, এই বৃথা অহংকারই জীবকে ভগবান থেকে পৃথক করে রেখেছে।

[নিরভিমানের দৃষ্টান্ত—ঠাকুর ও নাগ মহাশয়]

"বল, নাহং, নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু, 'আমি' না, 'আমি' না, প্রভু, 'তুমি', 'তুমি', 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়!' আহা, ঠাকুর কি নিরভিমানী ছিলেন! কি রকম করে অভিমান ত্যাগ করতে হয়, নিজে করে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অহংকে নাশ করবার জন্য কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা মাথায় করে গঙ্গায় ফেলে আসতেন। মাথার বড় বড় চুল দিয়ে কালীবাড়ীর পাইখানা সাফ করেছেন।

আর নাগ মহাশয়ের জীবনী দ্যাখ না—এ তো সেদিনের কথা, তাঁর অহংকারের লেশ মাত্র ছিল না। আমি ঐ রকম জীবনই পছন্দ করি। অভিমান, অহংকার ভেতরে পুষে রেখে, বাইরে গেরুয়া! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! নাগ মহাশয়ের কি গেরুয়া ছিল? ভাব, ভক্তি, প্রেমে নত হয়ে গেছলেন। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলির তলে', একথা কি শুধু পুঁথিতেই থাকবে? গিরিশ বাবু বলেছিলেন, 'মহামায়া

নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গেলে তিনি এত ছোট হয়ে গেছলেন যে আর বাঁধতে পারেন নি।

"আমার সর্ব প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শনের তিন চার দিন পরে, একদিন হঠাৎ রামদয়াল বাবুর সঙ্গে বাগবাজারে দেখা হয়। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমায় পরমহংসদেব ডেকেছেন, একবার যেয়ো।' আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললুম, 'আমায় ডেকেছেন! কেন?' আহা, তিনি যে এত দয়াময় তখন তা বুঝতে পারি নি। তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। তখনও তিনি আমায় 'তুই' 'মুই' করে কথা বলতেন না। যাবামাত্রই আমায় বললেন, 'এই কাঠগুলো পঞ্চবটীতে নিয়ে যাও তো।' সেদিন ঠাকুর সেখানে চড়ুইভাতি করবেন। এই রকম করে তিনি আমাদের খাটিয়ে নিতেন কত।

"কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি যেন স্বামিজী এসেছেন। তাঁকে দেখে, কেঁদে পায়ে পড়ে বললুম, আর তোমায় যেতে দেব না। তুমি থাক, তোমার দর্শনে আবার ভারত জেগে উঠবে। আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পা জড়িয়ে ধরে বললুম, 'মহারাজ, স্বামিজীকে ছেড়ো না, অনেক দিন পরে এসেছেন;' আর স্বামিজীকে বললুম, ঠাকুরের কৃপায় আমার অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত শিক্ষা হচ্ছে।"

রাত্রি ৯॥ টা বাজিয়াছে। প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ পাইতে গেলেন।

চতুর্থ সর্গ

অহংকারই মায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

['আমি' ও 'আমার'ই সংসার]

আজকাল মঠে ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ), প্রেমানন্দ মহারাজ অবস্থান করিতেছেন। যেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিমূর্তিতে বিরাজ-মান। পূজাস্পদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে ঠাকুর বলিতেন, 'ব্রজের রাখাল', আর বাবুরাম মহারাজকে বলিতেন, 'সখী'। ঠাকুর যে ছয় জনকে নিত্যসিদ্ধ, 'ঈশ্বর কোটি' অন্তরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিতেন, শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তাঁহা-দিগের মধ্যে দুইজন। পূজনীয় রাখাল মহারাজের পরমহংস অবস্থা—পূর্ণ জ্ঞানী; ভক্তকুলচূড়ামণি বাবুরাম মহারাজ —মুর্তিমান ভক্তি; আর ত্যাগিকুলচূড়ামণি মহাপুরুষ মহারাজ —মহাতপস্বী।

উক্ত মহাপুরুষত্রয়ের একত্র আবির্ভাবে মঠে দিবারাত্রি আনন্দের মেলা। অফুরন্ত অবিরাম আনন্দ। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতেই শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীর ঘরে পবিত্র বাল-ব্রহ্মচারী সাধু ভক্তবৃন্দের তাল-লয় সংযোগে সুমধুর কীর্তন :—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম।
অপূর্ব শোভন, ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ময় ॥
শোক-তাপিতজন সবে চল,
সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে,
প্রেম জাগিবে অন্তরে ॥
কত যোগীন্দ্র-ঋষি-মুনিগণ,
না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে,
ভুলিল চরাচর ॥
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ,
বিমল বিভুগুণ বন্দন ;
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত,
নৃত্য করিছে অবিরাম ॥"

সঙ্গীত শ্রবণে ভক্তগণের মনে হইত বাস্তবিকই যেন ভবজলধির পার দেখা যাইতেছে—উহা তাঁহাদের সহজসাধ্য। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।' 'যে ভক্ত আমায় সর্বদা স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুলভ।' প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ও অপরাহ্নে মহারাজ-গণের জীবন্ত উপদেশ। সন্ধ্যা আরাত্রিক, ধ্যানের পর আবার সেই সুমধুর ভজন ও বিশেষ করিয়া বাবুরাম মহা-

রাজের দিব্য ভাব-বাণী! এইরূপে দিবারাত্র আনন্দ চলিত।

সাধু-সঙ্গ-রূপ শীতল জাহ্নবী জলে স্নান করিবার মানসে কলিকাতা হইতে আজকাল দলে দলে ভক্তের আগমন হয়। বিশেষত ছুটির দিনে।

রবিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ ইং ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। আজ আফিসের ছুটি। ডাঃ কাঞ্জিলাল, কৃষ্ণ বাবু, কালীপদ বাবু প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। বারুইপুরের বৃদ্ধ উকিল কেদার বাবু আজ কয়েকদিন হইতে মঠে বাস করিতেছেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল ঠাকুরের পরম ভক্ত, উচ্চাঙ্গের গুপ্ত সাধক ও শ্রীশ্রীমার বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত। ইনি আজ মঠে রাত্রি-যাপন করিবেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বাবু ঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্ত মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের অনুরাগী ভক্ত। প্রায়ই মঠে আসেন। কলিকাতা ইটালি অঞ্চলে বাস করেন। (অধুনা পরলোকগত)। ইহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। ইনি মঠে আসিলেই মহারাজ-গণকে গান শুনাইয়া যান। আজ ইনিও মঠে রাত্রিযাপন করিবেন।

শীতকাল; ছোটবেলা। মঠে ঠাকুরের সন্ধ্যা আরাত্রিক শেষ হইয়াছে। জপ-ধ্যানান্তে ভক্ত ও সাধু ব্রহ্মচারিগণ ক্রমশ বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া সমবেত হইতেছেন। ঘরে একখানি সতরঞ্চি পাতা, তাহারই উপর এক পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন বাবুরাম মহারাজ। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা।

[সকল কাজে পারদর্শিতা দরকার]

বাবুরাম মহারাজ—(সম্মুখস্থ ব্রহ্মচারীদের দেখাইয়া) "'এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে হবে—রাঁধতে, কুট্‌নো কুট্‌তে, ঠাকুর ঘরের কাজ, পূজা, হিসাব রাখা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি সকল কাজে পারদর্শী হওয়া দরকার। এদের ঐ রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত ভাল মন্দ গাল দিচ্ছি—এদেরই ভালর জন্যে। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই, এদের কত ভালবাসি। তোদের (ব্রহ্মচারীদের প্রতি) বকি ঝকি বলে কিছু মনে করিস্ নি!

[আত্মীয়ে ভালবাসা মায়া, সর্বভূতে ভালবাসা দয়া]

(নিজকে দেখাইয়া) "বে' থা করলে আর কি হত, দুচারটে ছেলে মেয়ে হত; কেউ ভক্ত, কেউ বদমায়েস হয়তো হত, তাতে কত কষ্ট হত বল দেখিনি। আর এখন, ছাখনা, সকল ভক্তকে ছেলের মতন ভালবাসি। সে নিজের দুটো একটার উপর টান হত, এ দেশশুদ্ধ লোককে ভালবাসতে পাচ্ছি। একজনকে দেখলুম ভাইপোর উপর ভারি দ্বেষ, অথচ নিজের ছেলেকে কত ভালবাসে। আমি তো দেখে ভারি চটে গেছলুম। সাধু হয়ে গেছি বলে আর কিছু বললুম না।

[মনের মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে]

"গেরস্তদের এই সব সংকীর্ণতা। 'আমার,' 'আমার,'

করেই মল। 'আমার বাড়ী', 'আমার ঘর', 'আমার ছেলে'; অথচ চক্ষু বুজলেই কে কোথায় থাকেন তার ঠিক নেই। গৃহস্থরা সবই ঠিক করছে, কেবল মন মুখ এক করে ভেতর থেকে 'আমি', 'আমার' না করে যদি 'তুমি', 'তোমার' অভ্যাস করে, তা হলেই অনাসক্ত হয়ে যায়, সিদ্ধ হয়ে যায়। 'আত্মাত্মীয়গ্রহভ্রান্তিশান্তিমাত্রাবিমুক্ততা।' 'আমি', 'আমার', ইত্যাকার ভ্রান্তি-নিবৃত্তিই মুক্তি।

[অহং-সাপ হতে সাবধান]

"প্রভু, তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার ছেলে মেয়ে এমন কি এই দেহটা পর্যন্ত তোমার, প্রভু, তোমার। 'নাহং, নাহং, নাহং। তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু।' 'ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা'। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' এই অহংই সকল অনর্থের মূল। এই অহং শালাকে নাশ করতে হবে, মেরে ফেলতে হবে, তা না করে এই অহং-সাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষছি! কাজেই তার দংশনে ছট ফট করতে হচ্ছে, তবুও তাকে বুকে করে আঁকড়ে ধরে আছি। তাকে ত্যাগ করতে মায়া হয়, এমনি অজ্ঞান! গীতা বলছেন,

'যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

[ভগবানে আত্মসমর্পণ]

"এই ভাবটী পুষ্ট করতে হবে, তবেই সংসার-বন্ধন থেকে

মুক্ত হওয়া যাবে। 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী' এই আত্মসমর্পণের ভাবটি ঠিক ঠিক ভেতরে আনতে হবে।"

এক ঘর লোক, সব নিস্তব্ধ, চুপ। যেন সব ধ্যানস্থ, আলপিনটি পড়িলেও তার শব্দ শোনা যায়। সকলের মনকে ৩।৪ ধাপ ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিলেন।

পরে কাঞ্জিলাল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, অমুক পূর্ববঙ্গের অনেক বড় বড় লোককে চেলা করেছেন। এমন বড় লোক আছেন, যাঁরা আপনাদের বিষয় কিছুই জানেন না, এমন কি কখনও শোনেন নি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

["ন শ্রীঃ সুখায় ভগবন্ দুঃখায়ৈব হি বর্দ্ধতে"—যোগবাশিষ্ঠ।]

বাবুরাম মহারাজ—ঠাকুর বলতেন, জগতে যে যা করছে ভালর জন্যই। ঠাকুর আমাদের অর্থ দেন নি। আর আমরাও যেন কখনও ওতে না ভুলি। অর্থ পেয়েই তো লোকে ভগবানকে ভুলে যায়। অর্থই তো অনিষ্ট করে। ছাখ না, কত বড় বড় মঠের মোহান্তদের কত অর্থ, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ঠাকুর ও সব আমাদের দেবেন না। কত লোক সেবাশ্রমের জন্য জমি টাকা দিচ্ছে, কয়টা লোক আর মঠকে ছায় ?"

(ইটালীর কৃষ্ণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) "সেই ব্যক্তি কাশীর

সেবাশ্রমে কত টাকা দিয়ে গেল, আর আমাদের বললে মঠের জন্য মাসে মাসে একশত টাকা উইল করে গেছি। পরে দেখা গেল সে টাকাও সেবাশ্রমের নামে। এ সব ঠাকুরের দয়া। টাকা হলে অভিমান হয়, অহংকার হয়, গোলা হয়, বারুদ হয়, ছাখ না ঐ সব যুদ্ধ।" (তখন ইউরোপে ভীষণ জার্মান যুদ্ধ চলিতেছিল।)

[দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক চাই]

অমুক বড় লোক দেখে চেলা করেন, আমরা বড়লোক টড়লোকের ধার ধারি না। আমরা যুবকদের চেলা করতে চাই। দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক চাই। যারা পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সারা দুনিয়ায় ঠাকুরের এই পবিত্র ভাব প্রচারে ব্রতী হবে। দাম্ভিক, নাস্তিক বড় লোকগুলো কি আর মানুষ!

[ঠাকুরের ভাবে দেশ ভাসুক]

"আমার ইচ্ছা করে এবং ঠাকুরকেও মাঝে মাঝে বলি, গৌরাঙ্গ অবতারে নদে ভাসিয়ে দিলে, কিন্তু কৈ ঠাকুরের ভাবে তো দেশটা এখনও ভাসল না। আমি এই দেখে মরতে পারি, তার সাধ হয়।"

অমূল্য মহারাজ—যে জিনিসটা ধীরে ধীরে বাড়ে সেটা বহুদিন থাকে। খড়ের আগুন যেমন শীঘ্র জ্বলে তেমনি শীঘ্রই আবার নিভে যায়।

বাবুরাম মহারাজ ইটালীর কৃষ্ণকে বলিতেছেন, এইবার তোমার একটু গান হোক।

ঐ ঘরের তক্তাপোষের উপর হইতে হারমনিয়ম, বাঁয়াতবলা, মন্দিরে পাড়া হইল। নীরদ মহারাজ বাঁয়া তবলা বাঁধিয়া দিলেন। কাঞ্জিলাল ডাক্তার তানপুরা ধরিলেন, কৃষ্ণবাবু গাহিতেছেন—

"শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ-প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন,
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে দাও তারে দরশন॥"

আবার গান হইতেছে—

"রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী, থেকোনা থেকোনা
তাহে বিভোর॥
জনম-মরণ বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযূষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর॥

ধর্মাধর্ম-সুখদুঃখ-শান্তি-জ্বালা দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে
নাহিক নিস্তার।
জ্ঞানকৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম ডোর ॥
রামকৃষ্ণ নাম বলরে বদনে, মোহের যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না, কেটে যাবে তোর
ঘুমেরি ঘোর ॥”

[সাধুগিরি হতে সাবধান]

(গান থামিলে) বাবুরাম মহারাজ—“তোদের সিদ্ধ হতে হবে। আমরা, বাবা, সাধুগিরি টাধুগিরি চাই না। ঠাকুর বলতেন, কোন্ শ্যালা সাধু! ‘আমি সাধু’ এই অভিমানও ঠাকুরের ছিল না। আমরা ঠাকুর ও স্বামিজীকে আদর্শ নোব। হৃষীকেশী সাধুদের আদর্শ (ideal) স্বরূপ নিলে হবে না। তাদের বোল্ ‘জগৎ তো ত্রিকালমে হ্যায় নেই।’ এদিকে সব নিজের নিজের স্বার্থের জন্য ছোটাছুটি, মারামারি। আমরা, বাবা, সাধুও নই, গেরস্তও নই, বিরক্তও নই, ভোগীও নই। আমরা ঠাকুরকে মানি, আর তাঁকেই আদর্শ (ideal) স্বরূপ নিইচি। সেই জন্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, পবিত্রতা এই সবের দিকে লক্ষ্য না রেখে, শুধু হৃষীকেশ টিশিকেশে যারা যায়, তাদের উপর আমি ভারি চটা। ভিক্ষা করে খাবে আর কুড়েমি করবে বৈ তো নয়?

[ভগবানে মন স্থির করা চাট্টিখানিক কথা নয়]

“ভগবানে মন স্থির করা কি চাট্টিখানি কথা রে, বাবা!

নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন ধ্যান করলে একেবারে জমে যায়। তা না হলে—শুধু আকাশ পাতাল ভাবা! ঠাকুর-ঘরে দেখেছি তো, ধ্যান করতে বসে কেউ ঢুল্‌ছে, নয় তো কাসছে, গলা খাঁকৃড়ি দিচ্ছে ইত্যাদি। হৃষীকেশে ঝুপড়িতে থাকলে বলে বিরক্ত সাধু! হয় তো দুপুরে কোথাও গল্প মেরে সন্ধ্যায় একটু জপটপ করে শুয়ে পড়ল, ব্যাস্।

[ভগবান ভাবের বিষয়]

"তোরা সব ভক্ত হবি, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা? ঠাকুর বলতেন, এক স্বামিজীই জ্ঞানের অধিকারী। ভগবানকে পেতে হলে ভাব চাই, ভক্তি চাই। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? এই বলিয়া গান ধরিলেন—

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরমযোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে" ॥

"ছুঁচে কাদা মাখা থাকলে, চুম্বকের আকর্ষণ অনুভব হয় কি? নিষ্কাম কর্মদ্বারা মনের ময়লা কেটে গেলে তবে ভাব, ভক্তি, ভগবানকে পরমাত্মীয় বোধ হয়। হৃদয় সরস হয়। কিন্তু 'কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।' কর্মেন্দ্রিয় সংযম করে যে মনে মনে বিষয় চিন্তা করে সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা হয়।

[চাই রজোগুণ]

"ত্রিকালজ্ঞ স্বামিজী বলতেন, সমগ্র দেশ সত্ত্বের ভান করে তমোতে ডুবে রয়েছে। রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে কি সত্ত্বে পৌঁছান যায়? তাই তিনি সর্বসাধারণের ভেতর সেই নিষ্কাম কর্মের প্রচার করে গেছেন, যা একদিন পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভারতে প্রচার করেছিলেন। কালস্রোতে ঐ ভাবটি চাপা পড়াতে, দেশ ক্রমশ তমোতে ডুবে যাচ্ছিল। তাই ঠাকুর ও স্বামিজী এলেন, দেশকে উদ্ধার করবার জন্য। যার যা পেটে সয়, মা তার জন্য সেই ব্যবস্থা করেন; জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম যে যেমন অধিকারী।

[ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম লক্ষ জপের সমান]

সকাল সন্ধ্যায় একটু জপ ধ্যান করে বাকি সময়টা পরচর্চা কুড়েমিতে কাটানর চেয়ে নিষ্কাম কর্ম করা ভাল নয় কি? মহারাজ

(ব্রহ্মানন্দ স্বামী) বলেন, যারা ঠিক ঠিক নিষ্কাম ভাবে দীন, দরিদ্র, আর্ত রোগীর সেবা করে তাদের লক্ষ জপের কাজ হচ্ছে। এ স্তোক বাক্য নয়, সত্য কথা। চিত্ত শুদ্ধ হলে তখন কর্ম ত্যাগ।

[হীরে মতি সুলভ কৃষ্ণে মতি দুর্লভ]

বাবুরাম মহারাজ—ঠাকুর বলতেন, হীরে মতি বাজারে টাকা দিলে ঢের মেলে, কিন্তু কৃষ্ণে মতি দুর্লভ! এই ভাব, ভক্তি সমাধি লাভ করবার জন্য সাধন করতে হবে। প্রথম নিষ্কাম কর্ম করা চাই, শুধু পুঁথিতে পড়লে কি হবে? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, তা না হলে চলবে না। দ্যাখ না, শশী মহারাজ কি ভয়ানক কর্মবীর; এঁদের সব আদর্শ করে নে না।

[একমাত্র শশী মহারাজই মঠের গোড়া]

"এই যে মঠ, ঠাকুর-বাড়ী দেখছিস, এর গোড়া হচ্ছেন শশী মহারাজ। তোর রাখালও নয়, শরৎ, বাবুরাম, এমন কি স্বামিজীও নয়। আমি জোর করে বলতে পারি, একমাত্র শশী মহারাজই এর কারণ।

"আলমবাজার মঠে স্বামিজী প্রভৃতি সবাই ত ঠাকুর পূজায় আপত্তি তুললেন। একমাত্র শশী মহারাজই প্রতিবাদ করলেন। তিনি সেই ছেঁড়া মাদুরের উপর ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করতেন। একদিন স্বামিজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুরপূজা তুলে দিবার জন্য রাগ করে বলরাম বাবুর বাড়ী

চলে গেলেন। একমাত্র শশী মহারাজ পূজার পক্ষপাতী ; তিনিই আলমবাজার মঠে রইলেন। পরদিন বলরাম বাবু আবার ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

[শশী মহারাজের সময়ে ঠাকুর পূজা]

"আগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হত না, নিজেদের জন্যই রান্না হত, পরে স্বামিজী প্রচলন করে দেন। শশী মহারাজের আমলে, ঠাকুরের পূজা আরও বেশী ভাবে হত। এখন তো সব ছাঁটকাট দিয়ে পূজা হয় ; আগে দাঁতন থেঁতলে তুলার মতন করে দেওয়া হত, এখন ও সব মানসিক দেওয়া হয়।

[শশী মহারাজ দাক্ষিণাত্যের দিকপাল]

"মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শশী মহারাজ ও স্বামিজীর সুখ্যাতি ঘরে ঘরে। আহা! শশী মহারাজ ওদিক্‌কার দিক্‌পাল ছিলেন। মাদ্রাজীদের যে এত গোঁড়ামি, শূদ্রেরা থুতু ফেলবার জন্য হাতে ভাঁড় নিয়ে তবে রাস্তায় বেরোয়, যাদের দেশে এমনি গোঁড়ামি, তিনি সেই দেশের ব্রাহ্মণকে দিয়ে শূদ্রদের পরিবেশন প্রীতির সহিত করিয়েছেন।"

বাবুরাম মহারাজ—(অমূল্য মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা শশী মহারাজের জীবনী লেখবার চেষ্টা কর না ?

বাবুরাম মহারাজ কিয়ৎক্ষণ আপন মনে ধীরে ধীরে হাতে তালি দিতে দিতে হরিবোল, হরিবোল, বলিতে লাগিলেন।

[শশী মহারাজের নিষ্কাম কর্ম যোগ]

অমূল্য মহারাজ—একদিন শশী মহারাজকে মাদ্রাজে দেখলুম খুব পরিশ্রম করে এসে কাপড় ফেলে দিয়ে, শুদ্ধ কৌপীন পরে, মাতুরে শুয়ে পড়লেন। তার দুমিনিট পরেই দাঁড়িয়ে উঠে, স্বামিজীকে ঠিক যেন সামনে দেখে বললেন, 'ছাখ দেখিনি, কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে খেটে প্রাণটা গেল, তোমার জন্যই তো মাদ্রাজে এসেছি, আর পারি না, এই কথা বলেই তখুনি একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে, ঠিক যেন তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাই, আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এ সব কথা বলেছি, মাপ কর। তুমি যা বলবে আমি ভাই তা করতে সদা প্রস্তুত।'

[শ্রীশ্রীমা আদর্শ রমণী]

সকলে নিস্তব্ধ। পুনরায় বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"তোরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরিত্র অনুকরণ কর না। তিনি তো এখনও জীবিতা রয়েছেন। আর তোরাও তো তাঁর কৃপা পেয়েছিস, তাঁর দর্শন পেয়েছিস, একি কম ভাগ্যের কথা! সাক্ষাৎ জগদম্বার কৃপা! ফটোতে তো মা কত স্থানে ভোগ খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঐ বেতো শরীরে, নিজে কাহারও সেবা নিচ্ছেন না। পরিচিত হোক, আর অপরিচিত হোক, যে কেউ দেশে তাঁর কাছে যাচ্ছে তাকে কত যত্ন, কত সেবা! দেশে নিজে রাঁধেন, জল তোলেন, এমন কি ভক্তদের জন্য

কোথায় ভাল দুধ, ভাল আনাজ, আহা, তার জন্য এক মাইল পর্যন্ত খুঁজে মা নিজে নিয়ে আসেন। ভক্ত প্রসাদ পেয়ে গেল, বাড়ীতে ঝি চাকর বাসন মাজবার কেউ নেই, তার হুঁস নেই, শ্রীমা নিজে তাদের লুকিয়ে সক্‌ড়ি পাড়ছেন।

[শ্রীশ্রীমা ও কর্মযোগ]

"একজন লোক বাগবাজারে মার কাছে নালিশ করেছিল, মঠে বড় কাজ করতে হয়। মা উত্তর দিলেন, হাঁ, হাঁ, কাজ করবে বৈ কি, কাজ করলে মন ভাল থাকে!"

অমূল্য মহারাজ—আমি মাকে ভক্তদের সেবার জন্য তাঁর দেশে এক চুপড়ি বাজার মাথায় করে বাড়ীর পিছন দিয়ে আসতে দেখেছি।

রাত্রি সাড়ে নয়টা, প্রসাদের ঘণ্টা পড়িল। একে একে ভক্তিভরে মহারাজের শ্রীচরণোপরি মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণামান্তে সকলে প্রসাদ পাইতে চলিলেন।

পঞ্চম সর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[স্বামী বিবেকানন্দের বৈষ্ণব ভাব]

আজ শুক্রবার, ৯ই পৌষ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, ইংরাজী ২৪শে ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃঃ। মঠের পূর্ব দিকস্থ নীচের বারান্দায় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বড় বেঞ্চির উপর এবং কয়েকটি সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে এবং পার্শ্বে ছোট বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ৩টা হইবে।

বাবুরাম মহারাজ—ঠাকুরের কাছে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মপিপাসু লোক আসতেন। কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ আবার ব্রহ্ম-জ্ঞানী। তিনি কাহারও ভাব নষ্ট করতেন না। যিনি যে ভাবের সাধক, যেমন অধিকারী, তাঁকে ঠিক সেই ভাবের পথ দেখিয়ে দিতেন।

[স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের অধিকারী]

"ঠাকুর বলতেন, একমাত্র স্বামিজীই জ্ঞানের অধিকারী আর সকলে ভক্তির। ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব

চেপে বেশীর ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর স্বামিজী ভক্তিকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। কিন্তু স্বামিজীর মতন ভক্তিমান লোক আর কয়টা আছে ?

[ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ]

"ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছলেন। তখন বরাহনগরে মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে, সব বৈষ্ণবভাব হয়েছিল। তাই দেখে স্বামিজী একদিন বললেন, 'বৃন্দাবন থেকে তোরা তিলক মাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।' এই বলে সর্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তিলক প্রভৃতি কাটলেন। তার পর বললেন, 'দে ঝুলি মালা দে।' ঝুলি মালা নিয়ে বিদ্রূপ করে চক্ষু বুজে জপ করতে লাগলেন, 'নিতাই ঠক্ ঠক্, নিতাই ঠক্ ঠক্।' সব হাসির রোল উঠল। খানিক পরে ঝুলি মালা রেখে বললেন, 'খোল নিয়ে আয়, এবার কীর্তন হবে।' এই সব কথা তিনি বষ্টুমি দীনতায় বললেন। খোল টোল এলে, বললেন, 'আমি মওড়া গাইচি তোরা সব গাইবি।' এই বলে গান ধরলেন— 'নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে।' আমরাও সব গাইলুম। ঐ লাইনটা কয়েকবার গাইবার পরই দেখি, স্বামিজীর দুই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারায় জল পড়ছে। রাস্তার লোক পাছে আসে বলে, দরজায় খিল দিয়ে খুব কীর্তন হতে লাগল। বেলা বারটা থেকে বৈকাল চার পাঁচটা অবধি এই ভাবে চলল। এরূপ কীর্তন কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর থাকতে

জমতে দেখতুম ; আর সেদিন জমেছিল। আমি ঠাকুরের পূজা করতুম ; ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে দেখি, বাহিরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে সব কীর্তন শুনছে। আমি তাদের ভিতরে যেতে বললুম। তারা হাত নেড়ে বললে, এখান থেকে বেশ শুনছি, বেশ শুনছি। তা না হলে গোলমাল হবে।”

বড়দিন উপলক্ষে স্কুল, কলেজ, অফিস বন্ধ। নূতন ও পুরাতন ভক্তবৃন্দ কেহ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনস্থল পঞ্চবটী, বিল্ববৃক্ষ, শ্রীশ্রীভবতারিণী ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৌকাযোগে, কেহ খেয়া-নৌকায়, কেহ বা পদব্রজে মঠে আসিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে “হরিবোল”, “হরিবোল”, বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া সম্মুখস্থ পোস্তার দিকে গমন করিলেন।

বেলা চারিটা। ঠাকুর-ঘর খোলা হইয়াছে। ভক্তগণ কেহ ঠাকুর-ঘরে কেহ স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। কেহ বা কলিকাতায় ফিরিবার জন্য পোস্তায় দাঁড়াইয়া ফিরতি নৌকার মাঝিকে ডাকিতেছেন, “ভিড়ো, ভিড়ো।”

[ভগবান লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য]

মঠ-বাড়ীর দক্ষিণ দিকের চাতালে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ কয়েকটি যুবক-ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে মেজেতে মাতুরে শুয়ে আছি। রাত্রি

দুপুর একটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল,. উঠে দেখি, ঠাকুর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে থু থু করে চারদিকে মুখামৃত ফেলছেন, আর বলছেন, 'দিস্‌নি মা, দিস্‌নি মা' ; মা যেন ধামা পুরে নাম যশ নিয়ে তাঁকে দিতে এসেছেন। তাই ঠাকুর বলছেন, 'দিস্‌নি মা, দিস্‌নি মা।'

[মান-যশ-লোকমান্য ভগবান লাভের অন্তরায়]

"মান-যশ, লোকমান্য ত্যাগ করতে হবে। ওসব হজম করা কি সোজা ? স্বামিজীই হজম করতে পারতেন। ভগবানকে পেতে হলে নাম-যশ হ্যাক্ থু করে ফেলতে হবে। ভগবানকে লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

[ডুবে যা মগ্ন হয়ে যা]

"তোরা তাঁকে লাভ করবার জন্য একেবারে ডুবে যা মগ্ন হয়ে যা, তাঁতে ডাইলিউট (dilute) হয়ে যা। 'ডুব দেরে মন কালী বলে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে। রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না মেলে।' একটু আধটু ধ্যান জপ করে আনন্দ না পেলে ছাড়তে নেই। তাঁকে লাভ করতে না পারলে, কেবল যন্ত্রণা—দুঃখ কষ্ট ভোগ! একেবারে তন্ময় না হলে, ভগবৎ-প্রেমে পাগল না হলে, রত্ন পাওয়া যায় না।

[চাই ব্যাকুলতা। বাসনা—কাল সাপ]

তাঁকে লাভ করবার জন্য রোক চাই—বুল ডগের ন্যায় রোক চাই। পাগলা কুকুরের মত হতে হবে। হাঁ, এই জীবনেই ভগবান লাভ করব 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্', এই রকম রোক চাই।

তীব্র ব্যাকুলতা চাই। তাঁকে পেতেই হবে, তা যেমন করেই হোক যে পথ দিয়েই হোক। তিনি যে আমাদের 'আপনার' লোক। আম খেতে এসেছিস আম খেয়ে চলে যা। পাতা গুনতে গুনতে সব শক্তিটা নষ্ট না হয়। ভোগ বাসনায় কি আত্মার তৃপ্তি হয়? বাসনা—কাল-সাপ। শেষে বিষের জ্বালায় ছট ফট করতে হয়। বিষয়-বাসনা বিষ অপেক্ষাও বিষ। সাপের বিষ শরীরকে পোড়ায়—বিষয়-বিষ মনকে দগ্ধ করে। ভোগে—রোগভয়, মৃত্যু; ত্যাগে—শান্তি, অমৃত।

[বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়]

'ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়াভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥'

ভোগে রোগ ভয়, সৎকুলের গৌরবে কুল ভঙ্গের ভয়, সম্পত্তিতে শত্রুপক্ষীয় রাজগণের নিকট হতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রু ভয়, রূপে বৃদ্ধত্বের ভয়, শাস্ত্রে পরাজয়ের ভয়, সদ্‌গুণে খল ব্যক্তিগণের নিকট হতে ভয়, ও শরীর ধারণে যম-ভয় আছে, অতএব দেখা যায় পৃথিবীতে যাবতীয় বস্তুই ভয়ান্বিত, কিন্তু বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়। এই ত্যাগ বৈরাগ্যের মতন কি আর জিনিস আছে! পার্থিব ঐশ্বর্য তার তুলনায় তুচ্ছ! তবে ঐ ঐশ্বর্য যদি—ভগবানের সেবায় লাগে তবেই অর্থের সার্থকতা। ঠাকুরের আশ্রয়ে

এসে, এই সব জীবন্ত মহাপুরুষদের সঙ্গ পেয়ে, যদি জীবন তৈয়ারী করতে না পারিস তো ধিক তোদের। যখন ঠাকুরের দরবারে এসে পড়েছিস, তাঁর চরণে মাথা বিক্রয় করেছিস, জীবন সার্থক করে নে; ভাব, ভক্তি, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এই সব অপার্থিব ভূষণে ভূষিত হয়ে যা! রাজপুত্র হয়ে তুচ্ছ লাউ কুমড়ায়—ভোগ বাসনা, নাম যশে—ভুলে থাকবি? ঠাকুর-মাঠাকরুণের সন্তান, মা ব্রহ্মময়ীর বেটা তোরা—সামান্য চুষিকাটি নিয়ে ভুলে থাকা কি তোদের শোভা পায়? 'দূর হয়ে যা যমের ভটা, আমি যমের যম হতে পারি ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।' ভাব, ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথা কি শুধু পুঁথিতেই লেখা থাকবে? জীবনে মূর্ত হবে না? আমি জীবন দেখতে চাই—জীবন—জ্বলন্ত জীবন। পাখীর মতন শুধু আওড়ালে চলবে না; ভাব-রসে একেবারে ডুবে যা, মেতে যা, ডাইলিউট হয়ে যা। তবেই মহামায়ার হাত থেকে নিস্তার! এই বলিয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
ডুব্ ডুব্ ডুব্ ডুব্‌লে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥"

সন্ধ্যা হইল; বাবুরাম মহারাজ পূত ভাগীরথী নীরে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন ও আচমনাদি করিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। আরাত্রিক ও স্তবপাঠান্তে আগন্তুক ভক্তগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নৌকাযোগে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন। কোন কোন ভক্ত আজ মঠে রাত্রিযাপন করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[মঠে ভগবান যিশুখৃষ্টের পূজা]

আগামী কল্য বড় দিন। আজ যিশুখৃষ্টের জন্মদিন। মঠে সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর বিশ্রাম-কক্ষে ভগবান যিশুখৃষ্টের পূজা ও আরতি হইবে। ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলিকাতা হইতে ফলমূল উপহার আনিয়াছেন। ভোগ দেওয়া হইবে। যিশুর প্রতিকৃতি অতি সুন্দরভাবে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প ও ধূপের গন্ধে ঘর আমোদিত বৃহৎ ঘরটি সাধু ও কলিকাতা হইতে আগত ভক্ত সমাগমে পরিপূর্ণ। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, খোকা মহারাজ (সুবোধানন্দ স্বামী), শুকুল মহারাজ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণও একে একে স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পূজনীয় শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ পাদ্রীদের ন্যায় কালো গাউন পরিয়া উক্ত ঘরের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেরই মস্তক পরম শ্রদ্ধায় তাঁহার চরণে নত হইল। যিশুখৃষ্টের সুমহান ত্যাগ ও পবিত্রতাময় জীবন কিয়ৎক্ষণ অনুধ্যানের পর পূজনীয় শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীর

আদেশে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ মাধবানন্দ স্বামী বাইবেল হইতে শৈলোপদেশ ইংরাজীতে পড়িতে লাগিলেন।

[যিশুর শৈলোপদেশ]

তাহার ভাবার্থ এই :—গালিলি, দিকাপালি, জেরুজালেম (Jerusalem), জুডিয়া এবং জর্ডন নদীর পরপার হইতে বিস্তর লোক ক্রাইষ্টের পদানুসরণ করিতেছেন দেখিয়া যিশু এক পর্বতে উঠিলেন এবং শিষ্যপ্রমুখ অসংখ্য ভক্তগণকে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিতে লাগিলেন—'যাঁহারা দীন হীন তাঁহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। যাঁহারা শোকার্ত, ধর্মপিপাসু ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা সকলেই ধন্য ; কারণ তাঁহারা শোকে সান্ত্বনা পাইবে ও তাঁহাদের ধর্মপিপাসা মিটিবে। যাঁহারা দয়াশীল, পবিত্রাত্মা, তাঁহারা ধন্য ; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। যাঁহারা ধর্মের জন্য, আমার জন্য, অকারণ মিথ্যা ধারণায় নিন্দিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত, তাঁহারা ধন্য ; কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত। মিথ্যা নিন্দা, লাঞ্ছনা ও তাড়নার জন্য দুঃখিত হইও না, বরং আনন্দ কর, উল্লসিত হও, কারণ প্রেমময় ভগবানের নিকট একদিন তোমাদের পুরস্কার সুনিশ্চিত। নির্যাতিত তোমরাই তো ধর্মের রক্ষাকর্তা, পৃথিবীর মেরুদণ্ড ও অজ্ঞান-অন্ধকারের দীপস্বরূপ। প্রতিবাসীকে ভালবাসিবে—শত্রু হইলেও ভালবাসিবে। চুরি, মিথ্যাকথা, ব্যভিচার করিবে না। কোন প্রকার শপথ করিবে না, কারণ

ভবিষ্যৎ তোমাদের অজ্ঞাত। পৃথিবীতে ঐহিকের প্রয়োজনে ধন সঞ্চয় করিও না—উহা চুরি হইবার ভয় আছে; স্বর্গ গমনের জন্য পুণ্য-ধন সঞ্চয় কর—কারণ তাহাতে নষ্ট বা চুরির ভয় নাই। একই ভৃত্য যেমন দুই মনিবের মন যোগাইতে পারে না, সেইরূপ কেহই ধন ও ঈশ্বর একত্রে উভয়ের দাসত্ব করিতে পারে না। নিজের জন্য কিছু চিন্তা করিও না, কেবল পরের কল্যাণ কর।

"প্রথম ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা কর; পরে স্ত্রী, পুত্র, মান, যশ, ভক্ষ্য, ভোজ্য সব পাইবে। ভগবানের নিকট যাচ্ঞা কর, প্রার্থনা পূর্ণ হইবে; তাঁহাকে অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তিনি দ্বার খুলিয়া দিবেন। তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছে যে, অন্নপ্রার্থী আপনার প্রিয় ক্ষুধার্ত পুত্রকে অন্ন না দিয়া প্রস্তর দিবে, কিম্বা মৎস্য চাহিলে সর্প দিবে? অতএব তোমরা মর্ত্য-মানব হইয়াও যদি স্বীয় সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে ভগবান তাঁহার সন্তানগণকে প্রার্থিত বস্তুদান করিবেন। সংসারে অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে। সাবধান, তোমরা লোক-দেখান ধর্ম করিও না। যখন কিছু দান করিবে, দক্ষিণহস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমাদের বামহস্তকে জানিতে দিও না। নির্জনে প্রার্থনা করিবে ও বলিবে, 'প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! মেকি অবতার হইতে সাবধান! আমার এই বাণী

যে জীবনে আচরণে পরিণত করিবে, সেই আমার পরম প্রিয়, তাহার জীবন-সৌধ দৃঢ়ভিত্তি পাষাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে তাহা না করিবে, নির্বোধের ন্যায় সাগর-বেলায় বালুকার উপর তাহার গৃহ রচিত হইবে। ফলে, তাহার জীবন-সৌধ ঝড়ে, বন্যায়, বৃষ্টিতে যে কোন সময়ে ভূমিসাৎ হইতে পারে।” যিশু এই সকল অমূল্য উপদেশ শেষ করিয়া পর্বত হইতে নামিলেন।

পাঠ শেষ হইল ; সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সকলে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন, “হে প্রভো, তুমি আমাদের হৃদয়ে ভক্তি, বিশ্বাস দাও, নির্ভরতা দাও, আমাদের মন শুদ্ধ কর, নির্মল কর, পবিত্র কর। আমেন্—তথাস্তু।”

ষষ্ঠ সর্গ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

[যুদ্ধের জের মিটিবে না]

আজ শনিবার, ইংরাজী ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাপদ মিত্র, পুলিন বাবু এবং আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছেন।

"ভীষ্ম", "নর-নারায়ণ", "উলূপী" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, কলিকাতা জেনারেল্ এসেম্ব্লিস্ ইন্ষ্টিটিউসনের ভূতপূর্ব কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয় খড়দহের সুপ্রসিদ্ধ ৺গুরুচরণ শিরোমণি (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের পুত্র। ইঁহারা বংশানুক্রমিক গুরুবংশ। শ্রদ্ধেয় ক্ষীরোদ বাবু শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর (বিবেকানন্দ) পরম অনুরাগী ভক্ত ও ঠাকুরকে অবতার বলিয়া মানেন। তৎকালে কলিকাতা বাগবাজারে বসবাস করিতেন, অধুনা লোকান্তরিত। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মিত্র মহাশয় হিলিংবাম অফিসে কাজ করেন এবং পুলিনবিহারি মিত্র মহাশয় সুগায়ক, উভয়েরই বাড়ী কলিকাতায়।

[জার্মানীর বৈজ্ঞানিক উন্নতি]

গঙ্গার সম্মুখস্থ মঠের পূর্বদিকে নীচের বারান্দায় ক্ষীরোদ বাবু বড় বেঞ্চির উপরে এবং সম্মুখের ছোট বেঞ্চে দুর্গাপদ বাবু ও একটি যুবক ভক্ত উপবিষ্ট আছেন। অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত ও সাধু পার্শ্বের বেঞ্চে বসিয়া আছেন। ইংরাজী ১৯১৫ খৃঃ ইউরোপে মহাসমরানল জ্বলিতেছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দুর্গাপদ বাবু ঐ সব যুদ্ধের কথাবার্তা কহিতেছেন। বলিতেছেন, জার্মানেরা কত বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে—ওরা কত সভ্য ও উন্নত জাতি, ইত্যাদি।

বেলা তিন চারিটা হইবে। ইতিমধ্যে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া বড় বেঞ্চির উপর ক্ষীরোদ বাবুর পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

[আদর্শ সভ্যতা ও উহার মাপকাটি]

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুরাম মহারাজ উত্তেজিত হইয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "ওরা (জার্মানরা) আবার সভ্য! ওদের আবার অনুকরণ করছেন !! বিজ্ঞানের উন্নতি করে ওরা কি করেছে! লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, নদীর মত রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। কত সতী পতিহারা, কত মাতা সন্তানহারা হচ্ছে। নিজেদের আত্মম্ভরিতা, অহংকার, জিদ বজায় রাখবার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের প্রাণ নাশ করছে। অজস্র অর্থব্যয় হচ্ছে! এই কি সভ্যতার আদর্শ, মাপকাটি? যে জাতি

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যত বেশী মানুষ খুন করতে পারে, সেই কি বেশী সভ্য ? ওরা কি ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য যুদ্ধ করছে ? না, ভগবানের জন্য ? না, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য ? এ তো বর্বরতা, পৈশাচিকতা !! এই কি science দিয়ে শান্তি স্থাপন করা ? তা কি কখনও হয় মশাই ?

[যুদ্ধের জের]

"এই যে যুদ্ধ লাগল, থেমে গেলেও কি এর জের মিটবে মনে করছেন ? জাতগুলোর মজ্জাতে মজ্জাতে ঈর্ষা ঢুকে রইল। একি যাবার ? চার পাঁচ বংশ (generation) পরেও পরস্পর চেষ্টা থাকবে ঈর্ষা করতে। যুদ্ধের দ্বারা কি জগতে শান্তি স্থাপন হয় ? একমাত্র ঠাকুরই শান্তি কিসে হয় দেখিয়ে গেলেন। আমাকে গোঁড়াই বলুন, আর যাই বলুন।

[রাম অবতারে ধনুর্বাণ কৃষ্ণ অবতারে বাঁশি রামকৃষ্ণ অবতারে এমনি]

"রাম অবতারে যুদ্ধ করেছিলেন ; কৃষ্ণ অবতারে বাঁশি আর গরু চরাবার লাঠি ; গৌর অবতারে দণ্ড কমণ্ডলু ; কিন্তু এবার কিছুই নেই—কেবল এমনি।"[১] তিনি কি মনে করলে, মার্ মার্, কাট কাট করে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অবতারত্ব প্রতিপন্ন করতে পারতেন না ? তা করবেন কেন ? তার দ্বারা কি শান্তি স্থাপন হয় ?

[১] ঠাকুরের দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধির ভঙ্গি দেখাইয়া দিলেন। ছবি দেখুন।

[ঠাকুরের মুসলমান ধর্ম-সাধনের উদ্দেশ্য]

"দেখুন না, হিন্দুদের উপর মুসলমানদের এমনি ঈর্ষা—সাত শত বছর হয়ে গেল, তবু ফাঁক পেলে কি আমাদের কাফের বলতে, ঘৃণা করতে ছাড়ে ? ঠাকুর এসেছিলেন, এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার জন্য। তিনি গোঁড়া হিন্দু হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নমাজ পড়তেন ও সাধন করতেন। কেন জানেন ?—এই বিরোধ মেটাবার জন্য।

[ঠাকুরের উদার সমন্বয় ভাব প্রচারে জগতের কল্যাণ]

"তাই বলি, যতই ঠাকুরের এই উদার সমন্বয়ভাব দেশে প্রচার হবে, ততই এই দেশের জগতের কল্যাণ। আমাদের জাতীয়তা হিসাবেও মহাকল্যাণ। আমরা কি গোঁড়ামি প্রচার করছি মনে করেন ? আগে সূক্ষ্ম, তারপর স্থূল জগৎ। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে—সূক্ষ্ম রাজ্যে, এই দুই বড় জাতির মিলন করে গেছেন, এইবার স্থূল জগতে প্রকাশ একদিন না একদিন হবেই, বিশ্বাস করুন। তাঁর সকল প্রকার সাধনার ভিতরই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই মুসলমান ধর্ম গ্রহণের ভিতর যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, একদিন না একদিন এই অধম পতিত জাতি তা বুঝতে পারবে। তাই বলি, ঠাকুরের ভাব প্রচার করা—কি গোঁড়ামি প্রচার করা ? জয় প্রভু ! জয় প্রভু !! জয় প্রভু !!! নাহং, নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু।

[ঠাকুরকে কে বুঝেছে]

"ঠাকুরের ভাব কয়টা লোক পেয়েছে, তাঁকে কয়টা লোক

বুঝেছে ? আমরা কি প্রথম প্রথম তাঁকে বুঝতে পেরেছিলুম ? আহা ! তিনি দয়া করে না বোঝালে কি আমরা তাঁকে ধরতে বুঝতে পারতুম ! যিনি সকল ধর্মের, সকল ভাবের জমাট মূর্তি ছিলেন, তাঁর ভাব প্রচার করলে কি মশাই গোঁড়ামি প্রচার করা হয় ?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[স্বপ্নাদিষ্ট মুসলমান ভক্তের কথা]

ক্ষীরোদ বাবু ও দুর্গাপদ বাবু চুপ। সকলেই তখন নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন—

“একদিন এখানে কুমিল্লা থেকে একজন মুসলমান ভক্ত এসে বললে, ঠাকুরের আদেশ পেয়েছি, তিনি স্বপ্ন দিয়েছেন বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য। সে একজন হিন্দুকে নিজের দেশ থেকে এখানে সঙ্গে এনেছিল, পাছে আমরা তাঁকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে না দিই। জগন্নাথ অন্য ধর্মাবলম্বীদের দর্শন দিবার জন্য সিং-দরজার কাছে পতিতপাবন হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের ঠাকুর সবাইকে একেবারে কোলের কাছে নিচ্ছেন—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান। মুসলমান ভক্তটি ঠাকুর ঘরে ঢুকে গদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। তারপর প্রসাদ নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেলে—আর খুব আনন্দ।

[খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর কথা]

সেদিন একজন খৃষ্টানও এসে বললে, 'আমাদের (খৃষ্টান) ধর্ম সব সামাজিকতা। স্বামিজীর ধর্মে যদি আমাকে দয়া করে নেন। কয়েকদিন একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতেন, ভক্তের জাত নেই।

[পাশ্চাত্ত্যের বাহ্য চাকচিক্য]

"যারা ঋষি-প্রতিষ্ঠিত সনাতন হিন্দু সভ্যতায় হতাদর করে, হিন্দুর হিন্দুত্বে গৌরব অনুভব না করে, ভোগ সর্বস্ব পাশ্চাত্যজাতিদিগের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের নকল করে, তাদের আমি দেখতে পারি না; তাদের চৌদ্দপুরুষেরও কিছু হবে না। ইউরোপের দেখাদেখি আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ছেলেরা সব এনার্কিষ্ট হচ্ছে, বলে, ঐ করে স্বদেশ উদ্ধার করব! ওদের যেমন বুদ্ধি! ঠাকুর স্বামিজী ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন; ভূত, ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখতে পেতেন। তাই বলতেন, fanaticism (ধর্মোন্মাদনা) করে কিছুই হয় না। ধীর স্থির ভাবে দেশসেবাব্রত লয়ে ধর্মকে জাগা। ধর্মই ভারতের প্রাণ। এই প্রাণ সতেজ থাকলে আর সব অনায়াসে হবে।

[আর্য-সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ]

"আর্যসমাজীগণ একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করে খুব খাতির টাতির করেছিলেন। স্বামিজী তাঁদের বললেন,

'fanatic (ধর্মোন্মাদ) এর দ্বারা কিছু হয় না। আমার গুরুভাই ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্য কত বলত, আমি তাদের কথা না শুনে ধীর স্থির ভাবে চলছি।

[কিসে ভাল প্রচারক হওয়া যায়]

"স্বামিজী বিলেত থেকে ফিরে আলমবাজার মঠে এলে, শশী মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামিজী, কিসে ভাল ধর্ম-প্রচারক (preacher) হওয়া যায়?' স্বামিজী মাথা হতে উপস্থ পর্যন্ত একটা একটা করে দেখালেন অর্থাৎ প্রথম, মাথায় হাত দিয়ে বললেন, মেধা; দ্বিতীয়, মুখে হাত দিয়ে বললেন, ভাল চেহারা; তৃতীয়, গলা দেখিয়ে বলিলেন, সুকণ্ঠ; বুকে হাত দিয়ে—উচ্চ হৃদয়; পেটে হাত দিয়ে বললেন, অল্প আহার; ৬ষ্ঠ উপস্থ দেখিয়ে—ব্রহ্মচর্য। এই কটা একত্র হলে তবে ভাল ধর্ম্মপ্রচারক হওয়া যায়।

[গৃহস্থের পঞ্চ যজ্ঞ]

"আজকালকার লোকগুলো দেখছি খালি ওদের (ইউরোপিয়নদের) অনুকরণ করছে। নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ—এই যে পাঁচটা যজ্ঞ রয়েছে গৃহস্থেরা এগুলো করে কি? ও সব তো ভুলেই গেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে, না হতে পারছে ভাল ভোগী, না হচ্ছে ত্যাগী। ছিঃ, ছিঃ, এমনি করেই জীবনটা নষ্ট করছে।" এই বলিয়াই গাহিলেন :—

'মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।'
ইত্যাদি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এবার ঠাকুর নিরক্ষর হয়ে এসে দেখালেন, পণ্ডিতাই করে ধর্ম হয় না—practical life,—ধর্ম্ম, জীবনে পরিণত করা চাই। ঠাকুর ছিলেন পবিত্রতার জমাট মূর্তি। আর পবিত্রতাই ধর্ম।"

["যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ"]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক ছাত্র মাঝে মাঝে মঠে আসে। ছেলেটী এম্ এস্ সি পড়িতেছে। যুবকটীর অভিভাবক তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টায় আছেন। ছাত্রটী মহারাজের সম্মুখস্থ ছোট বেঞ্চে বসিয়া তাঁহার কথামৃত সাগ্রহে শুনিতেছে। বাবুরাম মহারাজের স্নেহদৃষ্টি ঐ যুবকটীর প্রতি পতিত হইলে, তিনি তাহার সহিত দু একটী কথাবার্তা কহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"ঠাকুর একদিন বলরাম বাবুর বাটীতে গিয়াছেন। নীচের যে ঘরে এখন শান্তিরামের ছেলে, ভগবান, পড়া শুনা করে, সেই ঘরে সেই সময় এক বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ঠাকুর দ্বিতলের পাইখানা থেকে এলে, আমি হাতে জল ঢেলে দিচ্ছি। নীচে একটি ছোট মেয়ে আঁচলে-বাঁধা একটি চাবির থলো, আঁচলের খুঁট ধরে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছিল। ঠাকুর ঐ মেয়েটিকে দেখাইয়া আমাকে বললেন, 'ছাখ, মেয়েরা

পুরুষদের এই রকম করে বেঁধে বন্ বন্ করে ঘোরায়! তুইও কি তাদের হাতে ঐ রকম ঘুরতে চাস?'

[আগে ধুলা-পড়া পরে সাপ ধরা]

"আগে ধুলা-পড়া শিখে তার পর সাপ ধরতে হয়। চরিত্র গঠন (character form) না করে, ভগবানে ভক্তি-লাভ না করে, বে' থা' করলে মহা বিপদে পড়তে হয়। শেষে নাকানি চোপানি খেয়ে মরে। (ঐ ছাত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া) আগে চরিত্র ঠিক কর, তার পর বে' থা' য়া হয় করিস করবি।"

সপ্তম সর্গ

ভগবানই একমাত্র 'আপনার' লোক

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ত্বঙ্‌ মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্‌।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ ॥"]

বিবেকচূড়ামণি।

আজ ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ইং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। ১২ই পৌষ, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-সপ্তমী, আজ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর জন্ম-তিথি বাসর। ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা-আরতি ও ধ্যান জপান্তে মঠের ব্রহ্মচারী ও সাধুবৃন্দ এবং কৃষ্ণবাবু, কেদার বাবু প্রভৃতি বহু ভক্ত সাধারণের বিশ্রাম-কক্ষে একত্রিত হইয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের কথামৃত পান করিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ—ভগবানই আমাদের একমাত্র 'আপনার'। আর যারা ভগবানকে ডাকে, তাঁকে ভালবাসে, তাঁরাও আমাদের 'আপনার'। ভগবানকে ভালবাসা—তাকে লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, নচেৎ জীবন বৃথা। 'এ জীবনে কাজ কিরে ভাই যদি দক্ষিণেপ্রেমে না গলে, এ রসনায় ধিক্‌ ধিক্‌ কালী নাম নাহি বলে।'

[জগতে কোন্ বস্তু সর্বাপেক্ষা হেয়]

শরীরের হেয়ত্ব সম্বন্ধে মহারাজ একটি গল্প বলিতেছেন, "জনৈক গুরুর এক সেবক শিষ্য ছিল। বহু বৎসর গুরু সেবার পর, গুরু শিষ্যকে বললেন, জগতে যা সর্বাপেক্ষা হেয় বস্তু তাই নিয়ে এস। শিষ্যটি ভাবতে লাগল, জগতে কোন্ দ্রব্য সর্বাপেক্ষা হেয়? ঐ পদার্থের সন্ধান করতে করতে শিষ্যটি এক ময়দানে উপস্থিত। তথায় বিষ্ঠার সাক্ষাৎ পেয়ে ঠিক করলে উহাই একমাত্র সকলের চেয়ে হেয়। এবং যেমন হাত দিয়ে তুলতে যাবে, অমনি বিষ্ঠা বলে উঠল, উঁহু, আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। শিষ্যটি শুনে অবাক! বিষ্ঠা বলতে লাগল, দেখ, পূর্বে আমি ক্ষীর, ছানা, রাবড়ী ছিলাম। আমার কত আদর যত্ন ছিল। একবার তোমাদের সংস্পর্শে এসে, আমার এই দুর্দশা। আবার মানুষের সংস্পর্শে এলে না জানি আরও কি দুর্দশা হবে! শিষ্যটির চৈতন্য হল। আর বিষ্ঠা গ্রহণ করা হল না, আশ্রমে এসে শ্রীগুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ হয়ে নিবেদন করলে, গুরুদেব, এই মল-মূত্র-বিষ্ঠা-প্রস্তুতকারী দেহের চেয়ে আর হেয় পদার্থ জগতে কিছুই নাই। এই তুচ্ছ নশ্বর দেহ আপনার সেবায় গৃহীত হলে কৃতার্থ হব। গুরু বুঝলেন, শিষ্যটীর প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে।

[মনের মোড় ফিরান]

"এই হেয় বিনাশী শরীর ধারণ করে যদি ভগবানে ভাব,

ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম লাভ না হয় তো ধিক্! ঠাকুর মনের মোড় ফিরিয়ে দিতে বলতেন। ভগবানের সঙ্গে একটা অন্তরের সম্বন্ধ পাতাতে হয়। তিনি ভাবের বিষয়, 'ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ?' (সুর করিয়া) 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়। কালীপদ সুধা হ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়, তবে যাগ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।' শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—যে কোনও একটা ভাব ধরে মন মুখ এক করে চললেই হল। ঠাকুর বলতেন, মন মুখ এক করাই সাধন। ঋষিদের শান্তভাব; দাস্য ভাব—যেমন মহাবীর হনুমানের, আর আমাদের শশী মহারাজের; তুমি প্রভু, আমি দাস; যশোদার বাৎসল্যভাব; কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের সখ্যভাব; আর শ্রীমতী রাধারাণীর মধুর ভাব।

[গুরু বাক্যে বিশ্বাস চাই]

"বিশ্বাস চাই—গুরু বাক্যে অটল বিশ্বাস। গিরিশ ঘোষ এক বিশ্বাসের জোরে উৎরে গেলেন। তাঁকে কত অসৎ সঙ্গে ও সমাজের খারাপ লোকের সঙ্গে চলতে হয়েছে। তবুও এক বিশ্বাসের জোরে তরে গেলেন। ঠাকুরের উপর গিরিশ বাবুর আঠার আনা বিশ্বাস।

[গোপালের মার নিষ্ঠা]

"পবিত্র জীবন গঠন করতে হলে আচার চাই, নিষ্ঠা চাই! চারা গাছে বেড়া দিতে হয়, নইলে গরু ছাগলে খেয়ে যেতে

পারে। আচার নিষ্ঠা সেই বেড়া। গোপালের মার কি নিষ্ঠা! উনি বাল-বিধবা ছিলেন; 'গোপাল,' 'গোপাল'[১] বলতেই চোখ দিয়ে জল বেরুত। তাঁর বাৎসল্য ভাব; তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন। কামারহাটীতে থাকতেন। প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এসে তাঁর কথা ভাল লাগতে, আর একদিন এলেন। ঠাকুর মা কালীর প্রসাদ দিতে চাইলেন—খেলেন না—কৈবর্তর অন্ন কিনা। পঞ্চবটীতে স্বপাক রান্না করছেন, এমন সময় ঠাকুর গিয়ে সেগুলি ছুঁয়ে দিলেন। তিনি আর সে অন্ন খেলেন না। কারুর ছোঁয়া তো খেতেনই না এমন কি ঠাকুর ছুঁলেন তাও খেলেন না—এমনি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু সেই গোপালের মাকে পরে দেখেছি, ঠাকুরের আমিষ পাতে খেতে কোন দ্বিধা করেন নি।

[পণ্ডিতদের লড়াই খোসা নিয়ে]

"ঠাকুর বলতেন, 'এগিয়ে যাও।' উদ্দেশ্য হারিয়ে চিরকালই নিষ্ঠাবান ও আচারী হলে কি হলো? দেখতে পাই, পণ্ডিতেরা খোসা ভুষি নিয়েই লড়াই করছে—aim (লক্ষ্য) হারিয়ে ফেলেছে। নিষ্ঠা চাই, আচার চাই, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না; এগুতে হবে।

১ ঠাকুরকে ইঁনি স্বীয় ইষ্ট, গোপাল-মূর্তিতে দর্শন করিবার পর হইতে তাঁহাকে 'গোপাল' বলিতেন।

হৃদয়ে ভাব, ভক্তি, প্রেমের বন্যা এলে, আচার নিষ্ঠা কোথায় ভেসে যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"মাতৃত্বে চ পিতৃত্বে চ গুরুমেব স্মরেদ্‌বুধঃ।
গুরৌ ন প্রাপ্যতে যত্তন্নান্যত্রাপি হি লভ্যতে॥" স্কন্দপুরাণ।

[গুরুদেব দয়া কর]

বাবুরাম মহারাজঃ—(কৃষ্ণ বাবুর প্রতি) "গুরুদেব দয়া কর" এই গানটা গা।

কৃষ্ণ বাবু গাহিতে লাগিলেন ঃ—

গৌর সারঙ্গ—ঠুঁরি।

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥ ১॥
হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥ ২॥
মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥৩॥

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ৪ ॥
রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ৫ ॥
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ৬ ॥
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ৭ ॥
জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে সদা শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ৮ ॥

গান শেষ হইলে, সকলে মাথা নত করিয়া শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

["যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"]

বাবুরাম মহারাজ ঃ—জীব কামিনী কাঞ্চনের দিকে, তুচ্ছ ভোগের দিকে বেহুঁস হয়ে ছুটছে। 'ওই সুখ, ওই সুখ বলে ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায়, সদা প্রতারিত' তবুও শেখে না, ভ্রান্তি ঘোচে না, প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না। বদ্ধজীবের মনগুলো দেখি হনুমানের মত একবার এ ডাল একবার ও ডাল করে বেড়াচ্ছে। সদাই চঞ্চল, অস্থির। লাঠালাঠি, অবিশ্বাস, স্বার্থ-পরতা, দ্বন্দ্ব, হিংসা এই নিয়ে তাদের সংসার। ঠাকুর বলতেন, সংই সার। এতে যে সুখ নেই, শান্তি নেই, তারা বুঝেও বুঝে না; মহামায়ার এই অদ্ভুত বন্ধন কাটতে পারে না। পাঁকাল মাছের মত জাল শুদ্ধ পাঁকেই মুখ গুজড়ে পড়ে থাকতে চায়। ইন্দ্রিয়-জনিত ক্ষণিক সুখে মনে করে, বেশ আছি। তারপর জেলে যখন জাল টানবে, শমন এসে বাঁধবে, তখন (সুর করিয়া) 'কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা, খুড়া জেঠা।'

সব স্থির হইয়া মহারাজের বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শুনিতেছেন।

[গুরু এক সচ্চিদানন্দ দুই নাই]

বাবুরাম মহারাজ—যেখানে সত্য, নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, অহৈতুকী ভালবাসা, সেইখানেই ভগবানের প্রকাশ, তিনি স্বয়ং জানবি। মোহপ্রাপ্ত জীবকে ভবসাগর

হতে উদ্ধার করতে, চঞ্চল অস্থির মনকে দমন করতে, ভগবান গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। সাধারণ গুরু যার যেমন সাধনা, যেমন অনুভূতি, কেউ দুশো, কেউ পাঁচশোকে ঐ সত্য, আনন্দময় পথ দেখিয়ে দেন, উদ্ধার করেন। কিন্তু জগদ্‌গুরু যখন আসেন, ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতিকে, সহস্র সহস্র মানবকে উদ্ধার করেন। ঠাকুর বলতেন, গুরু এক, সেই সচ্চিদানন্দ—দুই নাই। তাই শাস্ত্রে বলে, গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরু-শক্তি এক, কিন্তু মূর্তি-ভেদ মাত্র ; যেমন বৈদ্যুতিকশক্তি এক, তার প্রকাশ বিভিন্ন ; কোথাও অল্পশক্তি, কোথাও বেশী।

'পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্‌গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভবঃ॥'

"তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রিয় পুত্র, তুমি প্রিয় সুহৃৎ, তুমিই মিত্র, তুমি গুরু ও জগতের গতি, আমি তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন, তুমি আমার গতি, পৃথিবীর ভারস্বরূপ আমি তোমার শরণাগত, আমি তোমার, তুমি আমার। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা।

[ঠাকুর আমাদের সর্বস্ব]

"আমরা ঠাকুরকে জানি, তাঁকে মানি। তিনি আমাদের

পিতা, মাতা, সখা, আমাদের প্রাণ, আমাদের সর্বস্ব। ঠাকুর ছাড়া আর আমাদের নিজস্ব কিছুই নেই। আমরা ঠাকুরের, ঠাকুর আমাদের ; আমরা মায়ের, মা আমাদের।

[ঠাকুরের অদ্ভুত শিক্ষা কৌশল]

"আমরা প্রথম প্রথম অত ধর্ম কর্ম কি বুঝতুম ? পিতা-মাতার চেয়েও তাঁর আন্তরিক স্নেহ ভালবাসার টানে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম্। সে কী টান ! কী অহৈতুকী ভালবাসা ! তুলনা হয় না ! নরেনের জন্য হাউ হাউ করে কান্না ! আবার কখন প্রিয় সখার মত কত হাসি ঠাট্টা তামাসা করছেন। সাংখ্য-শাস্ত্রের গভীর সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষবাদ সোজা সিদে কথায়, কত হাস্যোদ্দীপক গল্প করে আমাদের তিনি বুঝাতেন। তাঁর হাবভাবসহ গল্প শুনে হেসে হেসে আমাদের তখন পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার মত হত। গল্পশেষ করে সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বলতেন, 'এ'ও বটে, ও'ও বটে', পুরুষও বটে, প্রকৃতিও বটে। কখন কখন আবার বাঈজীদের অনুকরণ করে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে হাত দিয়ে নাচ ! আবার কখন ধর্মের জটিল তত্ত্ব, যা বুঝতে কত ভাষ্য, তার আবার টীকা, তস্য টীকা পড়েও পণ্ডিতদের মাথা গুলিয়ে যায়, ঠাকুর হাসিঠাট্টা করতে করতে সেই সকল ধর্ম-তত্ত্ব সোজা কথায় মীমাংসা করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর অদ্ভুত শিক্ষা কৌশল আমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য একটা গভীর ছাপ দিয়ে গেছে। উচ্চ উচ্চ ধর্মতত্ত্বগুলি সরস করে বলাই ছিল ঠাকুরের শিক্ষার নিপুণতা।"

অষ্টম সর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সভা

প্রথম পরিচ্ছেদ

[মেম্বরগণের প্রতি প্রেমানন্দের উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা উপলক্ষে আজ মঠে আনন্দের মেলা বসিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজগণের একত্র সমাবেশ যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিধারায় মিলিত। এই মিলন হইলেও পরস্পরের একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য বেশ অনুভব হইতেছে। ঠাকুর জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সকল ভাবের জমাট মূর্তিস্বরূপ। আর স্থিত-প্রজ্ঞ স্বামী সারদানন্দ নিষ্কাম কর্মের, নিত্যসিদ্ধ স্বামী প্রেমানন্দ প্রেমভক্তির, যোগসিদ্ধ স্বামী ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ।

আজ রবিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২২, সাল। ইংরাজী ৫ই মার্চ, ১৯১৬ খৃঃ। মিশনের সাধারণ বাৎসরিক সভা। বাগবাজার হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ, সান্যাল মহাশয় নৌকাযোগে এবং অন্যান্য গৃহস্থ মেম্বর, দুর্গাপদ বাবু, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, কেদার বাবু, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন।

৬ই মার্চ, সোমবার, শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা।

বৈকালে visitors' roomএ সভা আরম্ভ হইল। সভাপতি —পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), পূজনীয় শরৎ

মহারাজ, সেক্রেটারী। শ্রদ্ধেয় স্বামী সুবোধানন্দ, শুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মঠের প্রায় সকল সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং মিশনের গৃহীমেম্বরগণ সভাতে যোগদান করিয়াছেন। ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

স্বামী শুদ্ধানন্দ মিশনের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিবার পর, হিসাব-পরীক্ষক ও সভ্য নির্বাচন কার্যও শেষ হইল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ—(বাবুরাম মহারাজকে) বাবুরাম, এইবার তুমি এদের (সভ্যদের) কিছু উপদেশ দাও। এরা শুধু হিসাব নিকাশ শুনে আর হাত তুলে অর্থাৎ ভোট দিয়ে চলে যাবে ?

বাবুরাম মহারাজ ঃ—(হাত যোড় করিয়া) তুমি রাজা—তুমি থাকতে, শরৎ মহারাজ থাকতে আমি কি উপদেশ দিব ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ—না, তোমায় কিছু বলতেই হবে। এই এক ঘর লোক তোমার কথা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আর এরা এই দুপুর রৌদ্রে, পয়সা খরচ করে, কষ্ট করে এখানে এসেছে কি এই শুক্‌নো হিসাব নিকাশ শোনবার জন্য ? এদের প্রাণে কিছু অমৃত ঢেলে দাও।

বাবুরাম মহারাজ ঃ—(ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার কথা কি অমান্য করতে পারি ? এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

[প্রচার কার্য বাহিরের দাঁত]

বাবুরাম মহারাজ ঃ—হাতীর দুরকম দাঁত থাকে—একটা

বাহিরে, আর একটা ভিতরে, খাবার জন্য। আমাদের এই যে প্রচার কার্য (missionary work) ওটা হাতীর বাহিরের দাঁতের মতন। ধর্ম-জীবন, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা এ সকলের মূল হচ্ছে চরিত্র। এই মূল ভিত্তি, চরিত্র, দৃঢ় না থাকলে কোনও কার্য্যই সুসিদ্ধ হবে না। বাহবার সাম্নে, উত্তেজনার বশে, কোন মহৎ কাজ করলেই চরিত্রবান হয় না। প্রতিদিনের শুভ চিন্তা ও শুভ কর্ম-অভ্যাসের সমষ্টিই চরিত্র।

[চাই চরিত্র, গুরুভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি]

"তোমরা সেবাশ্রমই কর বা famine relief work (দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা) প্রভৃতি যা কিছু কর, ও সব কিছুই কিছু না, যদি তোমাদের চরিত্র, তোমাদের গুরুভাইদের প্রতি পরস্পর গভীর ভালবাসা সহানুভূতি না থাকে। চাই— চরিত্র, পবিত্রতা, একনিষ্ঠা ; তবে কিছু হবে, তা না হলে কিছুই না। (গৃহস্থ মেম্বরদের লক্ষ্য করিয়া) শুধু মিশনের মেম্বর হলেই চলবে না, ঠাকুরের আদর্শে নিজের নিজের জীবন তৈরী করতে হবে। ভালবাসার দ্বারা জগৎকে আপনার করে নিতে হবে। তোমাদের নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, পবিত্রতা দেখে লোকে শিখুক। নিজের নিজের 'আমিত্ব'কে বর্জন করে, অভিমান, অহংকার নাশ করে, পুড়িয়ে ফেলে, চিত্ত শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে, কাজ করে যাও। অহংকার অভিমান মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে সেবা করতে হবে।

[প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা]

"ঠাকুর যেমন নাম চাইতেন না, ঠিক তেমনি তাঁর নাম বেজে উঠছে। স্বামিজী ইদানীং বলতেন, ওরে নাম যশে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। বলতেন—'প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা।' আপনারা সব চরিত্রবান হউন! মানুষ থেকে দেবতা হউন—তবেই জানবেন মিশনের কাজ ভালরূপে চলবে। (হাত যোড় করিয়া) আপনাদের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।" তারপর সভাভঙ্গ হয়।

রাত্রে আহারাদির পর বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার সম্মুখস্থ পূর্বদিকের নীচের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন। উত্তর দিকের পাশের লম্বা বড় বেঞ্চিতে কেদার বাবু, দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার), ব্রহ্মচৈতন্য বসিয়া আছেন। আরও কয়েকটি সাধু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত এদিক ওদিক কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

[সাধন কাকে বলে]

বাবুরাম মহারাজ ঃ—সংসারে—স্ত্রী, পুত্র, পরিবারে—কাম কাঞ্চনে—মন ছড়িয়ে আছে। মনকে গুটোতে না দোয়াই হচ্ছে অবিদ্যার কাজ। কিন্তু আমাদের মনকে বিষয় থেকে

গুড়িয়ে এক করতে হবে; মনকে এক করাই সাধন। সূতার ফেঁসো থাকলে, মনের কোণে এতটুকু বাসনা থাকলে, মন ভগবানে তন্ময় হয় না। ধ্যান জপের সঙ্গে সঙ্গে মনের খুব বিচার চাই—মনের কোন্ কোণে বাসনা লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে তাড়াতে হবে। একেই বলে, 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং।' এইরূপে মনকে জয় করাই দরকার, মনকে জয় করতে পারলেই, আত্মারাম হওয়া যায়—তাকেই মুনি বলে। শুধু জপ করছি বা প্রাণায়াম করছি—অথচ মনের অনন্ত বাসনাগুলো তাড়াবার চেষ্টা করছি না, তাকে আরও ফুল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখছি, তা করলে চলবে না।"

[সত্য যুগ]

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন —"উঃ, ঠাকুর আমাদের কতই দেখাচ্ছেন। আগে ঠাকুরের উৎসবে, আজ কাল রাত্রে যেমন ভক্ত হচ্ছে, সেই রকম লোক হলে, খুব হল মনে করতুম। (বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) আমরা, মহাশয়, ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক, অল্প আধার নিয়ে এসেছি, তাঁকে কি সব ঠিক ঠিক বুঝতে পারতুম। ঠাকুরের কৃপায় এখন কিছু কিছু বুঝছি। জানেন তো, কত লোক তাঁর কাছে আসতেন কিন্তু কয়টা লোক তাঁকে বুঝতে পেরেছে? যতই দিন যাচ্ছে, দেখছি লোকের আগ্রহ ততই তাঁর প্রতি বাড়ছে। ঠাকুর যখন এসেছেন, এটা সত্য যুগ বলে নিশ্চয় জানবেন।"

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কামাখ্যা প্রভৃতি পূর্ব বঙ্গে প্রচার কার্যে শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে অমূল্য মহারাজ, বিশ্বরঞ্জন মহারাজ, গাইয়ে বিনোদ প্রভৃতি মঠের অনেক ব্রহ্মচারী সাধু গিয়াছিলেন। আজ কয়েকদিন হইল তাঁহারা সদলবলে মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ সেই কথা বলিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ—আমি, মহাশয়, ঢাকায় গিয়ে দিনরাত ভক্তদের নিয়ে বকর্ বকর্ করতুম্। তাইতেই বায়ু চড়ে গিয়ে রাত্রে ঘুম হত না। ঠাকুরের কথা নিয়েই বলতুম —নিজের তো কিছুই ক্ষমতা নেই—তাঁর কথা, তাঁর ভাব নিয়েই তো বলতুম—তবুও রাত্রে ঘুম হত না। ক্ষুদ্র আধার কি না!! আর ঠাকুরের দেখেছি, মুহুর্মুহুঃ ভাব, মহাভাব, সমাধি হচ্ছে।

[ঠাকুরের কৃপা]

"ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার জন্য কোনও অপবিত্র লোক থাকতে পারত না—ঠাকুরের কৃপা না থাকলে আমি তাঁর কাছে কাছে থাকতে পারতুম না—এখন মনে করি, কি করেই যে ছিলুম!! একটু কিছু ভাব উদ্রেক হলেই, অমনি সমাধিস্থ!

[ঠাকুরের 'চৈতন্য-লীলা' থিয়েটার দর্শন]

"একদিন চৈতন্য-লীলা (থিয়েটার) দেখতে যাবেন, আমাকে

বললেন, 'ছাখ ! যদি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে যাই লোকে সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকবে, সব গোলমাল করে উঠবে। তুই আমার ঐ রকম হবার উপক্রম দেখলে, অন্য বিষয়ে খুব কথা বলবি।' এই বলে তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তারপর দেখতে দেখতে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধিস্থ হলেন। আমি আবার নাম বলতে থাকি, তবে সমাধি ভাঙ্গে। এই রকম ভাব, মহাভাব, সমাধি হওয়াটাই তাঁর স্বাভাবিক। মনকে জোর করে তিনি নীচে নামিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। আর আমরা, অল্প আধার কিনা, কত সাধন, ভজন, তপস্যা করি ঐ একটু ভাব সমাধি লাভ করবার জন্য। কেউ কেউ আবার একটু হতে না হতেই, লোকের কাছে দেখাতে থাকে (হাস্য)।

[কে বড়—শ্রীশ্রীঠাকুর না শ্রীশ্রীমা]

(বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া) "কিন্তু মহাশয়, আপনারা যাই বলুন, শ্রীশ্রীমাঠাকরুণকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়, তিনি শক্তি-স্বরূপিণী কি না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত ! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত। মা ঠাকরুণের ভাব সমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন ? তাঁর ধারণা করবার শক্তি কত !! বউটির মতন ঘোমটা দিয়ে থাকেন। মায়ের দেশের লোকেরা মনে করেন ভাইপো ভাইঝির জন্য তিনি সব করছেন।"

নবম সর্গ

ঠাকুরের জীবন জীবন্ত উপনিষৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[নিরক্ষর ঠাকুরকে লোকে মানে কেন]

আজ মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ, ইংরাজী, ১৯১৬ খৃঃ। রাত্রি ৮টা হইবে, বিশ্রাম-কক্ষে (visitors' room) স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পুস্তক পড়া হইতেছে। পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ, অখণ্ডানন্দ, ধর্মানন্দ, চিন্ময়ানন্দ, ব্রহ্মচৈতন্য প্রভৃতি মঠের প্রায় সকল সাধু ও কলিকাতা হইতে সমাগত কয়েকটি গৃহস্থ ভক্তও উপস্থিত। ঘরে একঘর লোক।

পাঠ শেষ হইলে পূজনীয় অখণ্ডানন্দ স্বামী বলিলেন, কাল থেকে এদের উপনিষৎ পড়াব।

বাবুরাম মহারাজ :—জীবন্ত উপনিষৎ থাকতে আবার কোন উপনিষৎ পড়াবে? ঠাকুরের জীবন হচ্ছে জীবন্ত, জ্বলন্ত উপনিষৎ। মহাপ্রভু না জন্মালে যেমন রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেম কেউ ধরতে বুঝতে পারত না, তেমনই ঠাকুর হচ্ছেন, উপনিষদের জীবন্ত মূর্তি। উপনিষৎ তো লোকে বহুকাল হতে পড়ে থাকে ও মুখস্থ করে, বহুকাল থেকে চলেও আসছে—তবে কেন লোকে আমাদের মূর্খ নিরক্ষর ঠাকুরকে মানে, তাঁর

কথা বেদবাক্য বলে মানে। তিনি নিজে তো উপনিষদও পড়েন নি, কিছুই না। তবে কি করে সেই জটিল ব্যাখ্যা সকল তিনি সোজা সিদে কথায় সকলকে বোঝাতেন ? কোন কালে, কোন জন্মে বেদ হয়েছে, সেই পড়বার জন্য ব্যাকরণ মুখস্থ কর, কত লোক তার আবার টীকা ভাষ্য নিজের মতের মতন করছে ; কত পণ্ডিত এর জন্য তর্ক বিতর্ক করছে, মীমাংসাও করতে পারে না। আর ঠাকুর, উপনিষৎ না পড়ে, সেই সব কেমন সোজা কথায় বুঝাচ্ছেন ; বেশী দিন হয় নি যে চাপা পড়ে গেছে। সামনে এমন সুন্দর ফোয়ারা থাকতে, কুয়ো খুঁড়ে তবে জল খেতে হবে ?"

[ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই জগদ্‌গুরু]

গত কল্য শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা সুসম্পন্ন হয়। ঐ উপলক্ষে দ্বাদশজন মনুষ্যজীবনের আদর্শ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস দেন। অদ্য মঙ্গলবার ঠাকুরের গৃহী ভক্ত শ্রীযুত কুমুদ বাবুর নিকট হইতে ১৲ টাকা ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনস্থল দক্ষিণেশ্বরে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া যান।

বাবুরাম মহারাজ :—(ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা কাল মাথা মুড়িয়েছিস, মনে করছিস বিধি নিষেধের পার হয়ে গেছি ? বিধি নিষেধের ভেতর দিয়ে না গেলে, কেউ কখনও ওর পারে যেতে পারে ? ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই হচ্ছে জগদ্‌গুরু। তোরাই না এখন জগদ্‌গুরু হলি ? কাল সন্ন্যাস

নিলি, আর আজ কিনা টাকা ভিক্ষে করে দক্ষিণেশ্বরে নৌকা ভাড়া করে গেলি ? এই spirituality (আধ্যাত্মিকতা) ? এই অনুরাগ ? ঠাকুরের সাধনস্থল দেখবার যদি এতই আগ্রহ হয়েছিল, ভিক্ষা না করে, হেঁটে বালী গিয়ে খেয়ামাঝির হাতে-পায়ে ধরে গঙ্গা পার হলি নি কেন ? কিংবা সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হলি নি কেন ? অথবা তাও যদি না পারতিস, হাওড়ার পুল দিয়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে গেলি নি কেন ? তবে বুঝতুম, তোরা জগদ্‌গুরু হবার উপযুক্ত! মনে করেছিস, সন্ন্যাস নিয়ে একটা মঠ করে ঠাকুরের ভাব প্রচার করবি, তা না হলে ঠাকুরের ভাব লুপ্ত হবে! হাজার মঠ কর, সন্ন্যাসীই হও, spirituality (আধ্যাত্মিকতা) যদি না থাকে, কিছুই হবে না। আর যারা মঠ কচ্ছে না, গৃহস্থ, তারা যদি ঠাকুরের আদর্শ নিতে পারে—জীবন দিয়ে দেখাতে পারে—তবে গেরুয়া না পরলেও তারাই পূজ্য হবে। যে ঠাকুরের ভাব নিতে পারবে, সেই বড় হবে,—তুমি সন্ন্যাসীই হও, একশো মঠ কর, আর গৃহস্থই হও। আমি বুঝি, ত্যাগ বৈরাগ্য এ দুটি না রেখে গৃহস্থের উপর জুলুম করা মহাপাপ !! তাঁর ভাব তিনিই প্রচার করবেন ও করছেন। মনেও করো না, তোমরা সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর ভাব প্রচার না করলে, আর প্রচার হবে না। তোমরা বরং ধন্য মনে কোরো যে গৃহস্থদের চেয়েও বেশী সুবিধা পাচ্ছ, এই সব (অখণ্ডানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে দেখাইয়া) জীবন্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে রয়েছ।

[গুরুভায়ের প্রতি ভালবাসা ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা]

অখণ্ডানন্দ স্বামী ঃ—আমরা হৃষীকেশে এক ঝুপড়ির মধ্যে ছয়জন প্রায় দুমাস ছিলুম। তাইতে অন্যান্য সাধুরা সব দেখে অবাক হয়ে গেছল এবং আমাদের বলত, 'মহারাজ, আপ্ ক্যায়সে থে—এত্না গুরুভাই এক সাথ্ রহতে হ্যাঁয়? হাম্ লোক দো গুরুভাই দো রোজ এক ঘরমে লেট্‌তে তো উপাধি লাগা দেতা হ্যাঁয়।' একথা আমি পরে বৃন্দাবনে মহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামিজীকে একদিন বলেছিলুম। তিনি আনন্দে ও গদগদভাবে উত্তর দিলেন, 'এ আর আশ্চর্য্য কি! তোমরা কেমন সুতায় গাঁথা! আর তোমাদের গুরু কি সাধু গুরু, না, মানুষ গুরু? যেসে গুরু হলে কি কলকাতার ছেলেদের এমন করে তৈয়ারী করতে পারতেন? তোমরা এরকম ভাবে থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি?'

"উনি (মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) তখন দাউজীর মন্দিরে থাকতেন, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে চা খেতে যেতুম।"

[চাই ত্যাগ বৈরাগ্য]

বাবুরাম মহারাজ—আমি কিন্তু বাস্তবিক বলছি, শুধু গেরুয়া টেরুয়া like (পছন্দ) করি না, চাই ত্যাগ-বৈরাগ্য। নাগ মহাশয়ের life (জীবন) বড়ই পছন্দ করি। তাঁর কি গেরুয়া ছিল? অথচ কত বড় ত্যাগী মহাপুরুষ লোক! এঁদের জীবন তো সেদিনের—বেশী দিনের নয় যে চাপা পড়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[নাগ মহাশয়ের সহিষ্ণুতা]

"এবার যখন ঢাকায় যাই, আসবার সময় নাগ মহাশয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম। নাগ মহাশয়ের এক বন্ধু বললেন যে তাঁর বাটীতে একজন ব্রাহ্মণ ভাগবত পড়াতে আসতেন, তিনি একটা শ্লোক পড়লে, নাগ মহাশয় সেইটে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করতেন। পণ্ডিতেরা ভাগবত পড়েছে, আর তিনি জীবন্ত ভাগবত দেখেছেন, তাই ওসব তাঁর 'করতলামলকবৎ' বোধ হত। তাঁর বাপ চটে গিয়ে বলতেন, 'হাঁরে, তুই কি পাঠ শুনতে দিবিনি? নিজেই ব্যাখ্যা আরম্ভ করবি?' নাগ মহাশয়ের অপার সহিষ্ণুতা, চুপ করে থাকতেন।"

[নাগ মহাশয়ের ভাব]

অখণ্ডানন্দ স্বামী ঃ—সুরেন মুখুয্যে (স্বামী প্রেমানন্দ ভারতী) ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন, বরাহনগর মঠে মাঝে মাঝে যেতেন। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে স্বামিজীর পর ইনি হিন্দু ধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা হতে একবার নাগ মহাশয়ের দেশে, দেওভোগ (নারায়ণগঞ্জ), তাঁর বাড়ীতে যান। মহাপ্রভু যেমন, 'এই মাটীতে খোল হয়' শুনে ভাবস্থ হয়েছিলেন, সেই রকম সুরেন্দ্রকে দেখে নাগ মশাই, দুহাত তুলে 'কলকাতা, কলকাতা' বলতে বলতে আনন্দে ও ভাবে নাচতে আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ ঠাকুর যেখানে থাকেন ইঁনি সেখান থেকে এসেছেন।

[স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থার কথা]

"স্বামিজী (বিবেকানন্দ) কী কঠোর তপস্যা করেছিলেন তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমেরিকাতে যাবার আগে তিনি যখন পরিব্রাজক হয়ে একাকী ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আমি তাঁর পেছু নিতাম। দেখেছি, কাঁধে এক ভুটানি কম্বল ১৫।২০ সের, আর একটা থলেতে বিস্তর বই সঙ্গে রাখতেন। একবার লিমড়িতে ভয়ানক কষ্টে পড়েছেন, তখন একজন অতি গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে আশ্রয় দেন। তিনি সেইখানে কয়েকদিন থাকেন। লিমড়ির রাজা তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন এবং আহার্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন রাজবাটীতে মিলবে বললেন। কিন্তু যিনি তাঁকে কষ্টের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণের মনে পাছে কষ্ট হয়, তাই তিনি রাজবাটীতে গেলেন না। শেষে রাজা, যতদিন স্বামিজী সেখানে ছিলেন, প্রত্যহ ষোড়শোপচারে ভোগ পাঠাতে লাগলেন। সেই গরীব ব্রাহ্মণ পর্যন্ত তাই খেয়ে ন্যধ হয়ে যেত।"

দশম সর্গ

জগতকে জাগাবে কে

প্রথম পরিচ্ছেদ

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"—গীতা, ১৮।৬৬

[প্রেমানন্দের অসীম ভক্তকৃপা]

আজ ১৫ই পৌষ, ১৩২১ সন। আরাত্রিক ও জপ ধ্যানান্তে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুর ঘর হইতে নামিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুতপদবিক্ষেপে পূর্ব দিকের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন দর্শক-কক্ষে সাধু ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে কেহই নাই। বাবুরাম মহারাজ উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, কইরে তোরা সব কোথায়? কেউ নেই যে? এখন পর্যন্ত একটা আলোও এখানে আসেনি?

বলিতে না বলিতেই চারিদিক হইতে সাধু ব্রহ্মচারীরা মুহূর্তের মধ্যেই শশব্যস্তে দর্শককক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকলে বসিলে পর বাবুরাম মহারাজও তথায় গিয়া দক্ষিণাস্যে বসিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারী গীতা পাঠারম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে তোদের আজ এত দেরী হল কেন?

জনৈক সাধু ঃ—সময় মত আসব কি, মহারাজ, এখানে যত বাইরের লোক আসে, থাকে। তাদের মধ্যে এমন সময় কেউ কেউ শুয়ে, কেউ বা ঘুমিয়েও থাকে।

বাবুরাম মহারাজ—আহা! আহা! এরা ঘুমাবে না? এখানেও ঘুমাবে না তো কোথায় ঘুমাবে? এমন ঘুম আর কোথায় হবে? এমন মুক্ত বায়ু, গঙ্গার হাওয়া কোথায় আছে? জানিস, সংসারে এদের কত চিন্তা ভাবনা, কত জ্বালা যন্ত্রণা? জ্বলে পুড়ে এখানে আসে একটু প্রাণ জুড়াতে, শান্তি পেতে। এমন শান্তির স্থান আর কোথায় আছে? বলছিস এরা সব ঘুমোয়! আর ঘুমোলই বা। তোরা সব আছিস কি করতে? তোরা সব বাড়ী ঘর ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছিস যে জাগাতে রে। ঠাকুর স্বামিজী এসেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জাগাতে। তোরা যে সব তাঁদেরই কাজ করতে এসেছিস। তোরা যে এই মোহনিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাগাবি—এই জগৎকে জাগাবি। আর এই কয়জন লোককে জাগাতে পারবি না? তোদের জাগ্রত দেখলেই যে এদের সব ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই মহারাজের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সকলে নির্বাক। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কক্ষ ও তৎচতুষ্পার্শ্ব যেন এক অভিনব নিস্তব্ধতায় অভিভূত হইয়া মহারাজের ওজস্বিনী বাণীর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য শতগুণ বৃদ্ধি করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে "নে, কি পড়বি পড়—" বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন।

ভগবদ্গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর জীবনালোকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে

লাগিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর জীবনের কতিপয় ঘটনাবলী বিশেষভাবে আলোচিত হইলে মহারাজ বলিতে লাগিলেন "গীতাই ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের জীবনই গীতা। ঠাকুর এ যুগের জীবন্ত গীতা। আহা, কে বুঝবে রে!"

দুই তিনটি শ্লোক পাঠ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[পবিত্রতাই ভগবান]

আজ ২৯শে আশ্বিন, ১৩২২ সাল, শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী। বাবুরাম মহারাজ চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্বদিকের বারান্দার বেঞ্চির উপর বসিয়াছেন। তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হইতে লাগিল; কেহ কেহ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনিও কাহাকে—"কি কেমন আছিস্?" কাহাকে বা "কেমন ভাল ত?" বলিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠ হইতে গম্ভীর স্বরে "জয় গুরু, শ্রীগুরু" ধ্বনি নির্গত হইয়া সমবেত ভক্তগণের মনকে স্থির ও শান্ত করিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখ, ভগবান কি ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হইল।

বাবুরাম মহারাজ:—ভগবান কি জানিস্? পবিত্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস যদি থাকে, তবে আর ভয় নেই। যা কিছু দরকার সব এসে যায়।

[সংসার কুকুরের লেজ]

"সংসারটা কি রকম জানিস ? কুকুরের লেজের মত। তাকে যতই টানাটানি কর না কেন, সিধে করতে পারবে না। যত চেষ্টাই কর না কেন, সংসারের দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখন একেবারে দূর হবে না। সংসারে মিথ্যাচরণ, হিংসা, দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি লেগেই আছে। আহা, মহামায়ার কি খেলা ! কেমনটি করে বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন করে রখেছেন। মায়ার ডোরে সব বাঁধা তাই সকলে ভুলে আছে। কিন্তু একজনকে বাঁধতে পারেন নি, কাকে জানিস্ ? স্বামিজীকে।

[স্বামিজীর উপর ঠাকুরের কৃপা]

"শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর বাগানে ছিলেন, স্বামিজী (তখন নরেন) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন —আপনার কত স্নেহ কত কৃপা পাচ্ছি, কিন্তু কি লাভ হল কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

"শ্রীরামকৃষ্ণ :— কিছুকাল যাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ হলো।

"নরেন—সময়ে বুঝব ? আমি যদি কাল মরে যাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ :—যা তোর কাল থেকেই হবে।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কৃপা স্বামিজীর উপর এ জন্যই কত করেও মহামায়া তাঁর কাছ দিয়েও এগুতে পারেন নি। স্বামিজীর কাছে এসে যেন তিনি কেঁচোটির মত থাকতেন।"

জনৈক ভক্ত :—তাঁর কৃপা লাভ হয় কি করে, মহারাজ ?

বাবুরাম মহারাজ :—ভিতর বাইর এক করতে হয়, সত্য ও সরল হতে হয়, তাহলেই তাঁর কৃপা হয়।

[হিন্দু ধর্ম ভূষণ্ডী কাক]

আজ ৩০শে আশ্বিন, শুক্লা নবমী, ১৩২২ সন। বেলা প্রায় বারটা হইবে। বাবুরাম মহারাজ ভক্তজন পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। বিবিধ বিষয় আলোচনার পর ধর্মপ্রসঙ্গ হইতেছে।

বাবুরাম মহারাজ :—রামায়ণে ভূষণ্ডী কাকের গল্প আছে। তাঁর কোন যুগেই মৃত্যু নেই। মহিষাসুর বধই বল, ত্রেতার রাবণ বধই বল, আর দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই বল, সকলই সে দেখেছে। চিরকালই সে আছে, আমাদের ধর্মও সেরূপ। আমাদের ধর্মের আদি নেই, অন্ত নেই, নিত্য শাশ্বত, পরম পবিত্র, অশেষ মঙ্গলকর এবং চির শান্তির আকর। ধর্মের আশ্রয় যে গ্রহণ করে ধর্মই তাকে রক্ষা করে। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। ধার্মিকের আবার ভয় কি ? 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

এ প্রসঙ্গ শেষ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

[নামের সঙ্গে নামী]

বীরেশ্বর কয়দিন যাবৎ বাবুরাম মহারাজের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আজ রাত্রে আরাত্রিকাদির পর সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মহারাজ, কি ভাবে থাকব একটু দয়া করে বলে দিন।

বাবুরাম মহারাজ :—কি ভাবে থাকবি? খুঁটি ধরে থাকবি, পবিত্রতা রূপ খুঁটি। নামের সঙ্গে নামী থাকেন। ভগবানকে সম্বল করে থাকবি। ঠাকুরই তোদের খুঁটি।

বীরেশ্বর :—মাঝে মাঝে 'আমি, 'আমার,' অভিমান, অহঙ্কার কত কিছু যে উঁকি মারে।

বাবুরাম মহারাজ :—কেন? ফোস্ ফোস্ ভাব একটু থাকবে না? নইলে যে কাজ হয় না। তবে ভেতরটা খুব নরম কোমল রাখা চাই। বাইরে একটু শক্ত থাকবেই। জানবি আর বলবি—'আমি প্রভুর দাস, আমায় মঠের সকলে ভাল বলে জানেন, আমি কি করে এর বিরোধী ভাব নিব? আমি ঠাকুরকে ডাকি, তাঁর কথা ভাবি, তবু শালা খারাপ ভাব আসবি?' এভাবে আবার নিজেকেও ফোস্ ফোস্ করতে হয়।

বীরেশ্বর :—আজকাল পুলিশের হাঙ্গাম এত বেড়ে গেছে যে একটা ভাল কাজেও political colour (রাজনীতিক আকার) আছে বলে সন্দেহ করে। কজেই আশ্রমের কাজকর্মাদি করবার যাদের বেশ ইচ্ছা আছে. তারাও করতে ভয় পায়।

বাবুরাম মহারাজ :—Sincerely (অকপটে) কাজ করলে কিসের ভয়? Policy (চতুরতা) থাকলে ভয় থাকে, জানিস। ঠাকুরের কাজে তো কোন policy নেই, সব খোলা, যেমন ভিতর তেমন বাহির। যেমন ভাবা তেমনি বলা এবং তেমনি কাজ।

এতে কোনই ভয় থাকতে পারে না। মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয়ই পাপ পাপ মৃত্যু।

তৎপর দিবস সকালে বীরেশ্বর কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে স্থির করিয়াছে। বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য—এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীস্বামিজীর মন্দিরের সমীপস্থ বেলতলায় একা পূর্বাস্য হইয়া নিভৃতে কি যেন ভাবিতেছেন। তাঁহার গৈরিকবসনভূষিত উজ্জ্বল কান্তি প্রভাতে সূর্যকিরণে স্নাত হইয়া যেন এক অনির্বচনীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মহারাজ ঃ—কি, যাচ্ছিস্ ?

বীরেশ্বর ঃ—আজ্ঞা হাঁ। তবে আসি মহারাজ, একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

মহারাজ ঃ—ভয় কি ? কৃপাদৃষ্টি ঠাকুরের আছে জানবি। বহরমপুর কবে যাচ্ছিস ?

বীরেশ্বর ঃ—বার তের তিন বাদ যাব।

মহারাজ ঃ—যাবার সময় একবার এখান হয়ে যাবি তো ?

বীরেশ্বর ঃ—খুবই ইচ্ছা রইল, মহারাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু হিন্দুর নহে খ্রীষ্টান মুসলমানদেরও]

আজ ২০শে কার্তিক শনিবার চতুর্দশী। মঠে অপরাহ্ণ

৩-৩০ ঘটিকার সময় পেঁাছিয়া বীরেশ্বর সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ পূর্বাস্য হইয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন, কয়েকজন ভক্ত ও কয়েকটি ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। নানাকথা আলোচনার পর ঢাকা মঠ ও মিশনের সাত বিঘা জমি ক্রয় করার প্রস্তাব উঠিলে জনৈক ভক্ত বলিলেন —সাত বিঘা জমি তো যথেষ্ট।

বাবুরাম মহারাজ—আমাদের মঠে কুড়ি বিঘা[১] জমি। তাতেই সকল সময় কুলিয়ে উঠতে চায় না। উৎসবের সময় কি কম লোক আসে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। ঠাকুর ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য আসেন নি, মুসলমানদেরও পীর ছিলেন।

জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ্ তো ভাল সাক্ষীকে—বিশিষ্ট ভদ্র-লোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন? মনে কর, তুই জজ্—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম। সবই কি সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ

[১] ইহা ১৯১৫ সনের কথা। এখন মঠের জমির পরিমাণ প্রায় ৬০ বিঘা।

শুনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই—বিশ্বাস, অচল অটল! সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না।

"একটি ছেলে বি-এ পড়ে, বীরভূম জেলায় বাড়ী। বে থা করেছে। আমায় মাঝে মাঝে পত্র দেয়। কয়েকদিন হল আমায় লিখেছিল তার ভয়ানক ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। খুব অশান্তি ভোগ করছে। কাতর হয়ে আমায় আশীর্বাদ করতে লেখে। আমি তাকে 'তুমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি তোমায় শান্তি দিন' —লিখি। পত্র পেয়ে কি সুন্দর উত্তর দিয়েছে।"

এই কথা বলিয়া মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে তাঁহার টেবিলের উপর থেকে পত্রখানা আনিতে বলিলেন। উহা আনীত হইলে মহারাজ উহা বীরেশ্বরকে পড়িয়া দেখিতে বলিলেন।

বীরেশ্বরের পাঠ সমাপ্ত হইলে মহারাজ তাহাকে বলিতে লাগিলেন— 'কেমন সুন্দর লিখেছে। উপদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে ডাকা অবধি দেখছি চাঞ্চল্য কোথায় দূর হয়ে গেছে—সব ইন্দ্রিয়গুলি যেন কেঁচো হয়ে আছে।' ইত্যাদি। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর। বুঝলি ?'

[সহজে ঈশ্বর ধারণার উপায়]

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, সহজে ঈশ্বরের ধারণা কি করে হয় ?

বাবুরাম মহারাজ—ঈশ্বর ফিশ্বরের হোমরা চোমরা একটা

ধারণা না করে ঠাকুরকে ডাক। তাঁকে স্মরণ মনন কর, তাঁকে ধ্যান কর। ঠাকুরের শরণাপন্ন হোস না কেন? তিনি যে কল্পতরু। বাবা! ঠাকুর স্বামিজীরই অন্ত পাই না, তা আবার ঈশ্বর! ঠাকুরের বিষয়ে স্বামিজীই বা কি কম গোঁড়া ছিলেন। কৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, আর যার যার কথাই বল না কেন, এমনটি আর হয় নি।

"ঠাকুর সর্ববস্তুতে চৈতন্য দেখতেন। দূর্বার উপর দিয়ে কোন কিছু নিয়ে গেলে, দাগ পড়লে তিনি কষ্ট পেতেন, নূতন কাপড় চড়্ চড়্ করে ছিঁড়লে তাঁর প্রাণ পড়্ পড়্ করে উঠত। সমাধি অবস্থায় কোন অপবিত্র লোক ছুঁতে পারত না।"

[বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ]

এই সব কথা বলিতে বলিতে মহারাজ নিস্তব্ধ হইয়া যেন কোন এক দিব্য লোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই অবাক হইয়া এতক্ষণ যাহা শুনিয়াছেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ পুনরায় বলিতেছেন—আহা! প্রভুর কি অপার দয়া!

নিজের মাকে (গর্ভধারিণীকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"মাকে ঠাকুর একদিন বলছেন—'যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া) মানত করলেই সব হবে।' চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষ্মণ।"

এভাবে যখন প্রসঙ্গ চলিতেছিল তখন স্বামী শুদ্ধানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, দেখছ, এদের গোঁড়া হবার উপদেশ দিচ্ছি।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী—তা বেশ, আপনি যা বলবেন তাতেই এদের কল্যাণ হবে।

বীরেশ্বর—একথা কটি শুনে আমাদের খুবই ভাল হয়েছে।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—ভাল হয়েছে মুখে শুনতে চাই না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী, আমরা দেখতে চাই।

বীরেশ্বর—আশীর্বাদ করুন যেন এ সব উপদেশের সার্থকতা সাধন এ জীবনে হয়।

স্বামী শুদ্ধানন্দ চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। পরে গম্ভীর স্বরে—

'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥'

বলিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন ও বলিতে লাগিলেন—তোদের এই শেষ জন্ম জানবি। কেবল ঠাকুরকে ডাক, তিনি যে কল্পতরু, যে যা চায়, সে তাই পায়। সকল শাস্ত্রের মূর্তবিগ্রহ তিনি। আহা, এমনটি কে কোথায় পাবে?

জনৈক ভক্ত—এরা খুব ভাগ্যবান, নইলে কি এদের উপর আপনার এতদূর কৃপা হত?

সূর্যাস্ত হইয়াছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে দেখিয়া স্বামী অরূপানন্দ (তখন ব্রঃ রাসবিহারী) বলিলেন—এখন একটু বাইরে বেড়িয়ে আসুন, মহারাজ! আপনার শরীর তো তত ভাল নয়।

বাবুরাম মহারাজ—আর এ শরীর যাক না তবু ভাল কাজে। এত অতি তুচ্ছ জিনিস।

ব্রহ্মচারী রাসবিহারী—এতক্ষণ বকলেন, খুব ক্লান্ত হয়েছেন।

বাবুরাম মহারাজ—খারাপ কথা নিয়ে তো আর বকাবকি হয় নি। ঠাকুরের কথা কইলে শরীর খারাপ হয় না।

[কাঞ্জিলালের সেবার প্রশংসা]

এই সব কথা হইতে হইতেই আরাত্রিকের ঘণ্টা পড়িল। সকলে আরাত্রিক দর্শনে যাইতে লাগিলেন। আরাত্রিকান্তে বীরেশ্বর পুনরায় মহারাজের নিকট গেল এবং বাবুরাম মহারাজের পদসেবার অধিকার লইয়া খুব আনন্দানুভব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ কাঞ্জিলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাবুরাম মহারাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেবায় যোগ দিলেন। তখন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ডাক্তার সব জানে কি না? ডাক্তারের কাছে শেখ্, কি করে সেবা করতে হয়।

একাদশ সর্গ

বিদগাঁয় (বিক্রমপুর) স্বামী প্রেমানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" —গীতা

[ভয়ই মৃত্যু]

ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাঁ[১] গ্রামে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহোৎসব। তথাকার ভক্তগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী রাম ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল, বিদগাঁয় শুভাগমন করেন। পর দিবস ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, ১৯১৩ খৃঃ, রবিবার, বিদগাঁ নীলখোলার মাঠে বিরাট উৎসব।

উৎসব ক্ষেত্রের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির। মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি বহুল পত্রপুষ্পে সুশোভিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহদাকার কীর্তন-মণ্ডপ। উষাকাল হইতেই বিভিন্ন গ্রাম হইতে কীর্তনের দল আসিয়া উক্ত মণ্ডপে কীর্তন করিতেছে। কীর্তন সমাপ্ত হইল। সমবেত ভক্তগণ মহারাজের শ্রীমুখের দুচারটি বাণী শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"আমি কি জানি, আর বলবই বা কি ? আমাদের ঠাকুরের অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। তার একটি উপদেশ যে পালন করতে পারে

[১] এই গ্রাম ও বহু সংখ্যক অন্যান্য গ্রাম কীর্তিনাশার গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

সে পবিত্র হয়ে যায়। তিনি সকলকে বলতেন, ভগবানের উপর নির্ভর কর। তাঁর এ কথাটি যদি কার্যে পরিণত করতে পারি তবে আমরা ধন্য হয়ে যাব।

"সংসারে ভয়ই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর হাত এড়াতে হলে নির্ভীক হতে হবে—ভয় দূর করতে হবে। এই ভয় দূর করবার উপায় হচ্ছে ভগবানকে আপনার জন মনে করে তাঁর উপর নির্ভর করা। যে ভগবানকে আপনার জন মনে করতে পারে, তার আর ভয় নেই—তার মৃত্যুও নেই। দেখ, একজন ইংরেজ নির্ভয়ে দেশ বিদেশ বন জঙ্গলে ঘুরে আসে। কারণ, সে জানে তার পশ্চাতে দাঁড়াবার, তাকে সাহায্য করবার জন্য সমগ্র ব্রিটিশ রাজশক্তি রয়েছে। সে সমস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আপনার মনে করতে পারে বলেই সে নির্ভীক। সেইরূপ আমরাও যদি অভয় ও আনন্দের আকর ভগবানকে আপনার জ্ঞান করে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি তবে আমাদের ভয় নেই। আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের আবার ভয় কি? আমরা 'অভী', তাই আমরা অমর। এ ঠাকুরেরই উপদেশ। আমরা যেন তাঁর এই উপদেশটি হৃদয়ে অনুভব করতে পারি এবং তদনুযায়ী কাজ করে ধন্য হতে পারি।"

[ভগবান সমদর্শী—তবে জগতে কেউ সুখী কেউ দুঃখী কেন]

বাবুরাম মহারাজ মধ্যাহ্ন সেবার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মুন্সিগঞ্জের কতিপয় উকিল ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন।

জনৈক ব্যক্তি—আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান। তাঁর নিকট সকলেই সমান। তবে আমরা কেউ সুখী কেউ দুঃখী কেন? কেউ রাজা কেউ ভিখারী কেন?

মহারাজ—যার যা কর্মফল। জগদ্বৈচিত্র্যই সৃষ্টিরহস্য। বহুর জন্যই সৃষ্টি। বিচিত্র কর্মফলই বহুত্বের পুষ্টিসাধক।

প্রশ্ন—কর্মফল হেতুই যদি লোক সুখী দুঃখী হয়, তবে সেই কর্মফল কি এ জন্মের?

মহারাজ—কেবল এজন্মের কেন হবে? জন্মজন্মান্তরেরও বটে। এ জন্মই যে জন্মজন্মান্তরের ফলস্বরূপ।

প্রশ্ন—আচ্ছা, তাই যদি হয়, বাইবেলে আমরা দেখতে পাই আদমের পতন (Adam's fall) হল কেন?

মহারাজ—আদম নিষিদ্ধ ফল (forbidden fruit) আস্বাদন করেছিল না? ভগবান ত তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, ঐ (forbidden tree) গাছের নিকট যেও না, (forbidden fruit) ঐ গাছের ফল খেও না। ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে, পতন হবে না?

তাঁহারা প্রশ্নোত্তরে পরিতৃপ্ত হইয়া করযোড়ে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে ঢাকা কলেজের অবসর প্রাপ্ত স্বনামখ্যাত অধ্যাপক রাজকুমার সেন ও অনেক উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকও মহারাজের দর্শনের জন্য আসেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[কলমায় স্বামী প্রেমানন্দ]

আজ ফুলদোল, বৈশাখী পুর্ণিমা, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩২০ সাল। ইংরাজী ২০শে মে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। আজ বাবুরাম মহারাজ বিদগাঁ হইতে ৪।৫ মাইল দূর কলমায় আসিয়াছেন। তিনি কলমার জমীদার ভূপতি বাবুদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত মহারাজ বিদ্যালয়ে আসিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে সুসজ্জিত তোরণ, তাহার শীর্ষে বড় বড় অক্ষরে "স্বাগতম্" লেখা। শিক্ষকবর্গ মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের বৃহৎ আঙ্গিনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা বৃহৎ প্রতিকৃতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ মহা আনন্দিত হইলেন। বিদ্যালয়ে মৌলবী আছেন কিনা খোঁজ করিলে মৌলবী সাহেব সম্মুখে আসিয়া 'আদাব' দিলেন, মহারাজও প্রতি আদাব দিলেন।

পরে মৌলবী সাহেবের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"মৌলবী সাহেব! দেখবেন, হিন্দু মুসলমানে যেন বিরোধ না হয়। হিন্দু মুসলমান একই ভগবানের সন্তান। আমাদের ঠাকুর সকলের জন্যই এসেছিলেন। তিনি কেবল হিন্দুদের অবতার নন, মুসলমানদেরও পীর। ঠাকুর আমাকে

দিয়ে মুসলমান ভক্তদের আসন করিয়ে নিতেন। দেখুন, কেমন করে আমাদের গোঁড়ামি দূর করে দিয়েছেন।"

তারপর মহারাজ ছেলেদের কয়েকটি উৎসাহপূর্ণ কথা বলিলেন—

"তোমরা যে দেশে জন্মেছ সে যে মহা পুণ্যভূমি। এদেশই কত ঋষি মহাপুরুষদের জন্মস্থান। কত বড় বড় মনীষী ভারতের সন্তান। এই দেখ না রামমোহন রায়, এত বড় মনীষী ভারতে আর জন্মায় নি। তারপর বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের কথা ধর না কেন। ভারতকে বর্তমান জগতের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলে কে ? কজন ভারতকে চিনত ? বর্তমান যুগের তথাকথিত সুসভ্য জাতি ভারতবাসীকে কীটের মত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেই সমগ্র জগতের চোখ খুলে গেছে। জগৎ দেখলে, ভারতে এত বড় সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষও জন্মায় ! তাঁর প্রভাবেই ভারত ভারতীর আজ সর্বত্র আদর। তোমরা তাঁদেরই অনুসরণ কর।"

তথা হইতে মহারাজ সেবাসমিতি সদনে গমন করিলেন। যথাসময়ে সেবাসমিতির উদ্বোধন কার্য শেষ হইলে মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—'দেখবি, এখানে কত ভক্ত আসবে। ঠাকুর এসেছেন, তাঁরই টানে তো আমরা আসছি, নইলে এ গণ্ডগ্রামে আসা সম্ভব হত কি ?'

[কলমা মহিলা সভায় বক্তৃতা]

সন্ধ্যার সময় মহিলাগণ মহারাজের মুখে কিছু শুনিবার জন্য

উদগ্রীব। তিনি বাড়ীর ভিতরে ঠাকুর-মন্দিরের পার্শ্বস্থ আঙ্গিনায় সমবেত মহিলাদিগকে বলিলেন—"মায়েরা, আপনারা ভেদ করবেন না। এই মা কালী রয়েছেন—এখানে ঠাকুর রয়েছেন—দুই এক। যিনিই কালী, তিনিই ঠাকুর। যিনি ঠাকুর, তিনিই কালী। যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ। জানেন তো আয়ান ঘোষ কালীর উপাসনা করত। একদিন শ্রীরাধা কৃষ্ণের কাছে রয়েছেন, এমন সময় আয়ান ঘোষ কুটিলার কথা শুনে দেখতে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে ৺কালীকেই দেখলেন এবং তাঁকে পূজা করলেন। কৃষ্ণ ও কালী এক। ভেদবুদ্ধিতে অনিষ্ট হয়—অকল্যাণ হয়।

"শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারে! তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়ে কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নেই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল—তাঁর ভাব সমাধি এ সব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছি। কিন্তু মার বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা! দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে—যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি—মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন—অনন্ত শক্তি! অপার করুণা, জয় মা!................"

দ্বাদশ সর্গ

নিয়মানুবর্তিতাই ধর্মের ক, খ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, ব্রহ্মচৈতন্য নীচে পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা হইবে।

আজ সকালে ব্রহ্মচারী ছক্কু, ব্রহ্মচারী প্রিয়নাথ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) ব্রহ্মচারী গোপাল (স্বামী গোপালানন্দ), ব্রহ্মচারী সনৎ (স্বামী প্রবোধানন্দ) বাচের নৌকা করিয়া গঙ্গার পূর্বকূলে ভক্তপ্রবর নারাণ বাবুদের বাড়ী হইতে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের জন্য পানীয় কলের জল আনিতে গিয়াছিলেন। মঠে তখন জলের কল ছিল না। শ্রীশ্রীমহারাজের পেট খারাপ; গঙ্গাজল তাঁহার সহ্য হইত না। নৌকাখানি ব্রহ্মচারী সনৎ কর্তৃক আনীত। কেহ কেহ মঠের কর্তৃপক্ষের আদেশ না লইয়া ঐ নৌকা করিয়া পরপারে গিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেছেন :—

"আমরা থাকতে থাকতেই দেখছি যার যা ইচ্ছা সে তাই করছে। কর্তৃপক্ষকে বলে কিছু করে না। এসব তো ভাল কথা নয়। এ রকম করে শৃঙ্খলা (discipline) ভঙ্গ করলে তো ভাল হবে না। নিয়মানুবর্তিতাই হচ্ছে ধর্মের ক, খ।

এর ভেতর দিয়ে না গেলে কি করে এরা আধ্যাত্মিক উন্নতি করবে।

[খামখেয়ালী ও স্বাধীনতা এক নয়]

"মঠ কি হট্টগোলের জায়গা? মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া নিয়েছে, যাক, ভিক্ষা করে খাগ গে। বাহান্ন লাক সাধু আছে, তাদের দল বাড়াক গে। এখানে ঠাকুরের আদর্শ নিয়ে কাজ করতে ও জীবন গড়তে হবে। ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্কাম কর্ম আমাদের চাই। কুঁড়ে আহাম্মকের দল বাড়াবার জন্য স্বামিজী এই মঠ করেন নি। আমাদের দেখবার তো আর কিছু বাকী নেই। ভারতবর্ষ ঘুরে * * অনেক * দেখে ঘৃণা ধরে গেছে। ছেলেদের ভেতর চাই নিয়মানুবর্তিতা (discipline) ও বাধ্যতা।* * * * ওর ভেতর দিয়ে গেলে তবে freedom (স্বাধীনতা) কি বস্তু বুঝতে পারবে। তা না হলে খামখেয়ালী কাজ করবে, কুঁড়ের দল বাড়াবে।* * * *

[উহার দৃষ্টান্ত]

"স্বামিজী ঠাকুরের শিষ্য, আমরাও তাই। তাঁর কথা আমরা কি রকম মেনে চলেছি! কেন? মানবার কি দরকার ছিল? আমরাও তো এক রকম স্বাধীন ভাবে চালিয়ে নিতে পারতুম। কিন্তু করি নি কেন? স্বামিজী হচ্ছেন ঠাকুরের প্রতিনিধি, তাঁকে ঠাকুরেরই মত মানতে হবে, না মানলে ঠাকুরকেই অমান্য করা হয়।* * * *

"স্বামিজী রোজ রাত্রি চারটার সময় ঘণ্টা মেরে মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের তুলে ধ্যান করাতেন। কারও শয্যাত্যাগ করতে একটু বিলম্ব হলে তাঁকে আর মঠে সেদিন ভিক্ষা দেওয়া হত না।

"একদিন আমার আর সারদার (ত্রিগুণাতীত স্বামী) উঠতে দেরী হওয়াতে স্বামিজী আমাদের বললেন, আজ আর মঠে ভিক্ষা পাবে না। গ্রামে গিয়ে মাধুকরী করে আজ খেতে হবে। সত্য সত্যই আমাদের তাই করালেন। আমরা মাধুকরী করে আনতেই স্বামিজী সানন্দে সেই সব খুলে একটু একটু মুখে দিতে লাগলেন। তাঁর কথা ঠাকুরেরই আদেশ জেনে আমরা সব করতুম।

[স্বামিজীর শিষ্য-পরীক্ষা]

"স্বামিজীর কাছে যদি কেউ চেলা হতে আসত, তিনি তাঁকে বলতেন, তোকে যা বলব তাই করতে পারবি? নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বাঘের মুখে যদি যেতে বলি অবিচারে যেতে পারবি? গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে বললে দিবি? এই রকম বাধ্য হওয়া চাই। এই রকম বাধ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে গেলে তবে সে স্বাধীনতা কি জিনিস বুঝতে পারে, উপযুক্তও হয়। আবার আজীবন একরকম নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে গেলে মনের বিকাশ হয় না। গড্ডলিকা প্রবাহের মত মন জড় হতে থাকে। তাও ভাল নয়। তিনি সেইজন্য যেমন ঐ রকম বাধ্য হতে

উপদেশ দিতেন, আবার সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে খুব মিশতে, নানা প্রশ্ন ও যুক্তি তর্ক করতে উৎসাহ দিতেন।

[জগতের চক্ষু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে]

"এই মঠে থাকতে পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা, মশাই (জনৈক ভক্তের প্রতি)। তোমরা মনে করছ এই মঠটা বুঝি সামান্য। সমস্ত জগতের চক্ষু এই মঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তা জান? এটা আমি ঠিক কথা বলছি। সমস্ত জগৎ ঘুরে এস, দেখতে পাবে। তোমরা সেই জগতের শীর্ষ হয়ে—শীর্ষ না তো আর কি—খামখেয়ালী যা তা করবে?

[জপ ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ]

গঙ্গাধর মহারাজ—আমি দুই তিন বৎসর পরে বহরমপুর থেকে তিন চার দিনের জন্য মঠে এসেছি। তখন মঠ ছিল নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে। স্বামিজী একদিন রাত্রি দুইটা অবধি সকলকে নিয়ে শাস্ত্রচর্চাদি করে বিশ্রাম করতে গেলেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি আমরাও তারপর বিশ্রাম করতে গেলুম। রাত্রি আন্দাজ চারটার সময় আমি উঠে দেখি, স্বামিজী মুখটুক ধুয়ে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, ওরে, Ganges, খুব জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে তোল। সবাই—ধ্যানট্যান করুক। সেই বারান্দায় তখন

শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, তারকদা রাত্রি দুইটার পর শুয়েছেন—সবে মাত্র ঘুম ধরেছে—কাঁচাঘুম। এমন সময় স্বামিজী আমায় বললেন, জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে তোল; বুঝুন একবার। আমি বললুম, এর মধ্যে ঘুম ভাঙ্গাবেন! স্বামিজী এমনভাবে উত্তর দিলেন যে, আমি আর তাঁর কথায় বাধা দিতে পারলুম না। আমি জোরে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঘণ্টা বাজাতে লাগলুম। শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, তারকদা প্রভৃতি তো চোটে লাল হয়ে বলতে লাগলেন, কে রে ঘণ্টা বাজায়? আমায় মারতে যান আর কি। আমার পেছনে স্বামিজীকে দেখে কিছু আর না বলে সকলে জপধ্যান করতে বসলেন। স্বামিজী বললেন, জপধ্যান করতে তোরা না বসলে নূতন ছেলেরা শিখবে কার কাছ থেকে?

"আর একদিন দেখি, স্বামিজী সকল সাধু ব্রহ্মচারীকে নিয়ে ধ্যান করতে যাবেন। সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) মহারাজকে বললেন, চল, ধ্যান করবি চল। তখন সারদা মহারাজের জ্বর। স্বামিজী বললেন, ধ্যান করলে জ্বর টর সব পালিয়ে যাবে। আয়, ধ্যান করবি আয়। আমি মনে করলুম, স্বামিজী বোধ হয় সারদা মহারাজের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু তা নয়। ওমা, সত্য-সত্যই দেখি তাঁকে ঠাকুর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝাড়া দুতিন ঘণ্টা বসিয়ে ধ্যান করালেন।"

ঐরূপ ধ্যানান্তে পূজনীয় স্বামী ত্রিগুণাতীতের জ্বর ছাড়িয়া যাইতে শুনা যায়।

গঙ্গাধর মহারাজ—(মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি) এক রকম সম্প্রদায় আছে, তাদের বলে * সম্প্রদায়—সাদা কাপড় পরে। তাদের মনে যখন যা খেয়াল ওঠে, তখন তাই করে।

মহাপুরুষ মহারাজ—হাঁ, তাদের দেখেছি, হাবাতের দল। ও রকম দল আমরা চাই না। আমরা মানুষ চাই। ঠাকুরের আশ্রয়ে এরা সব এসেছে, এরা নিশ্চয়ই সব ভাল, তাতে সন্দেহ নাই, তা না হলে আসত না। থাকতেও পারত না। সকলেরই বাড়ীতে কিছু না কিছু খাবার সংস্থান আছে, সে সব ছেড়েও যখন ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছে, অবশ্য এদের কিছু আধ্যাত্মিকতা আছে। কিন্তু আমরা চাই ওটাকে আরও ভাল করতে। (ব্রহ্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তোমরা সকলেই ভাল, কিন্তু আরও ভাল হতে হবে। না খেতে পেয়ে সাধু হওয়া আমরা চাই না, অমন চেলা লাখ লাখ মেলে, বিশেষত আজকাল, এই বাঙ্গলা দেশে।

(বাবুরাম মহারাজের প্রতি) "এদের ভেতর বেশ ভাল ভাল ছেলেও রয়েছে। মাষ্টার ছেলেদের মারে বকে ছেলেদের উপকারের জন্য, তেমনি আমাদেরও তাই করতে হয় তোমাদের ভালর জন্য। তোমাদের উপর আমাদের কিছু রাগ আছে যে বকি? ভাল হতে এসেছ; যাতে তোমাদের ত্রুটি গুলি দূর হয় তাই বলি।

"রাখাল মহারাজের ছেলেবেলা থেকে বালকের ভাব। বালকের মত কাটিয়ে দিচ্ছেন।"

গঙ্গাধর মহারাজ—মহাভারতে আছে—মা বাপ যদি ছেলে মেয়েদের মারে, মারবার সময় তাদের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অমৃত বর্ষণ হয়। কতবড় কথা বল দেখি।

বাবুরাম মহারাজ—আমি এখনও কোথাও যেতে গেলে মহারাজ, শরৎ মহারাজ, না হয় মা ঠাকরুণ যাকে হোক একজনকে বলে যাই, অভ্যাস হয়ে গেছে কিনা।